Vol- IV | Issue 2 | Rs- 50

বাংলা বিজ্ঞান কথা

ফেব্রুয়ারী ২০২৬

- বিজ্ঞান সঞ্চার—বিজ্ঞান থেকে জনমত পর্যন্ত
- আনবিক জীব বিজ্ঞানী ম্যাক্সিন এফ সিঙ্গার
- ‘নিপাহ’ ছড়াতে ফলাহারী বাদুড় কতটা দায়ী?
- কালিজ ফিজ্যান্ট

চল্লিশে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনা

সূচীপত্র

বিজ্ঞান সংবাদ ৪

চল্লিশ বছরে পা রাখল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনা ৬
ভূপতি চক্রবর্তী

বিজ্ঞান সঞ্চার—বিজ্ঞান থেকে জনমত পর্যন্ত ৯
নকুল পারাশর

গ্রহান্তরে জীবনের সন্ধান ১১
গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আনবিক জীব বিজ্ঞানী ম্যাক্সিন এফ সিঙ্গার ১৮
বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

'নিপাহ' ছড়াতে ফলাহারী বাদুড় কতটা দায়ী? ২২
সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

বক্সার জঙ্গলে কালিজ ফিজ্যান্টের দেখা ২৪
অমর কুমার নায়ক

লজ্জাবনত লজ্জাবতী ২৬
অরুণিমা ভৌমিক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ফেব্রুয়ারী মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৮

ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা ৩০

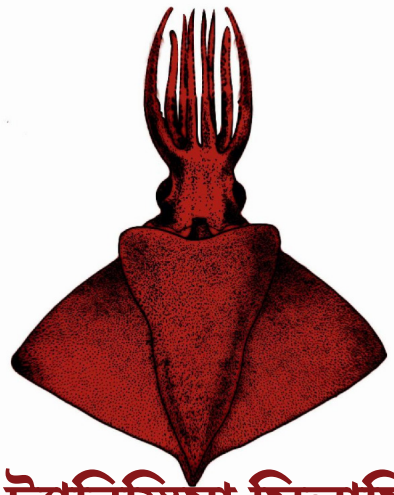

ট্যানিঙ্গিয়া সিলাসি

অক্টোপাস স্কুইডের একটি নতুন প্রজাতি *ট্যানিঙ্গিয়া সিলাসি*। সম্প্রতি তার দেখা মিলেছে আরব সাগরের গভীরে। ট্যানিঙ্গিয়া গণের এই দ্বিতীয় প্রজাতি গভীর সমুদ্রের জীববৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক ধারণাকে প্রসারিত করেছে। এই গণের অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রজাতি *ট্যানিঙ্গিয়া ডানা* পাওয়া গেইছিলো আটলান্টিক মহাসাগরে।

ICAR-সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং অমৃতা স্কুল ফর সাসটেইনেবল ফিউচারের বিজ্ঞানীরা এই নতুন প্রজাতিটি আবিষ্কার করেছেন। আণবিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত যে এটি এর নিকটতম আত্মীয়, *ট্যানিঙ্গিয়া ডানা* থেকে 11% এরও বেশি জেনেটিক বিচ্যুতি প্রকাশ করেছে। বেশ কয়েকটি শারীরিক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গিল ল্যামেলার সংখ্যা হ্রাস, একটি অনন্য আকৃতির ফানেল-ম্যান্টল লকিং কার্টিলেজ এবং স্বতন্ত্র ঠোঁটের আকারবিদ্যা। কেরালার কোল্লামের উপকূল থেকে প্রায় 390 মিটার গভীরতায় সংগৃহীত একটি একক স্ত্রী নমুনা থেকে এই প্রজাতিটি শনাক্ত করা হয়েছে। বিশিষ্ট সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী ডঃ ই.জি. সিলাসের সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে।

এটি দৈর্ঘ্যে 45 সেমি, কিন্তু এই পরিবারের সদস্যরাও বড় আকার ধারণ করতে পারে—আটলান্টিক প্রজাতির দৈর্ঘ্য 2.3 মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং ওজন প্রায় 61.4 কেজি হয়। যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে গভীর সমুদ্রের স্কুইড, এই প্রজাতির প্রাপ্তবয়স্করা তাদের স্বতন্ত্র শুঁড়ের অনুপস্থিতির জন্য পরিচিত। যাদের আটটি বাহু আছে কিন্তু দুটি লম্বা শুঁড় অনুপস্থিত। এই আবিষ্কারটি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ভারত মহাসাগরের গভীর অংশ কতটা অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

সম্পাদকীয়

28শে ফেব্রুয়ারির বার্তার

প্রতি বছর, যখন 28শে ফেব্রুয়ারি দিনটি ক্যালেন্ডারে ফিরে আসে, সমগ্র ভারত গর্ব এবং গভীর প্রতিফলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। 1928 সালেরএই দিনটি একটি উজ্জ্বল মুহূর্তকে চিহ্নিত করে, যখন সি. ভি. রামন বিশ্বের কাছে আলো এবং পদার্থের সূক্ষ্ম ছন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এটাই ছিল রামন প্রভাব—যা দুই বছর পরে ভারতকে পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। সেই ঘোষণার পর প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, তবুও তারিখটি তার ঔজ্জ্বল্য হারায়নি। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিজ্ঞান কেবল তথ্য বা সূত্রের সংগ্রহ নয়, বরং আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বকে দেখার, প্রশ্ন করার এবং বোঝার একটি উপায়। *বাংলা বিজ্ঞান কথা*-এর জন্য জাতীয় বিজ্ঞান দিবস একটি গতানুগতিক অনুষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি কিছু; এটি জাতির বৈজ্ঞানিক বিবেকের সামনে রাখা একটি আয়না, যা আমাদেরকে ভারতীয় বিজ্ঞান কোথা থেকে যাত্রা করেছে, আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং দেশটি স্বাধীনতার শতবর্ষের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে এটি কোথায় যেতে চায় তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

রামনের আবিষ্কার কেবল বৈশ্বিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে খোদাই করা একটি ব্যক্তিগত বিজয় ছিল না; এটি ছিল জাতীয় জাগরণের একটি মুহূর্ত। এটি আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেছিল যে, মৌলিকত্ব, বৌদ্ধিক সাহস এবং সুশৃঙ্খল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় গবেষণাগারগুলি থেকে বিশ্বমানের বিজ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে—এমনকি ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্যের অনুপস্থিতিতেও। সেই বার্তাটি আজও ততটাই শক্তিশালীভাবে প্রতিধ্বনিত হয় যতটা 1928 সালে ছিল। রামন প্রভাব ইতিহাসের জাদুঘরে কোনও স্মৃতিচিহ্ন নয়; এটি আধুনিক রামন বর্ণালীবিদ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে বেঁচে আছে, যা পদার্থ বিজ্ঞান, ন্যানো প্রযুক্তি, ওষুধ, পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ, ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং জৈব চিকিৎসা নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য একটি কৌশল। প্রতিবার যখনই একটি সমসাময়িক পরীক্ষাগার এই সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে, রামনের উত্তরাধিকারকে দ্বিধাহীনভাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস এইভাবে একটি জীবন্ত বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারকে উদযাপন করে—যা নতুন জ্ঞান, প্রয়োগ এবং সম্ভাবনা তৈরি করে চলেছে।

আমাদের বিশ্বাস, 2026 সালে জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের প্রাসঙ্গিকতা একটি একক আবিষ্কার বা একক নামের বাইরেও বিস্তৃত। আমরা এমন এক যুগে বাস করি যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীরবে, নিরলসভাবে মানব অস্তিত্বের প্রায় প্রতিটি মাত্রাকে রূপ দেয়—জনস্বাস্থ্য এবং জলবায়ু কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে শক্তির পরিবর্তন, ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্র এবং জাতীয় নিরাপত্তা পর্যন্ত। এবং বিপরীতভাবে, এটি এমন একটি যুগ যেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্য ক্রমবর্ধমানভাবে বিতর্কিত, ভুল তথ্য, অর্ধ-সত্য এবং প্রদর্শনীতে ডুবে রয়েছে। এই সময়ে, জাতীয় বিজ্ঞান দিবস আরও গভীর তাৎপর্য ধারণ করে—এটি যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধান, প্রমাণ-ভিত্তিক যুক্তি এবং বিজ্ঞানমনস্কতার চেতনার বার্ষিক পুনর্নিশ্চয়তা হয়ে ওঠে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি বা অভিজাত প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া ক্ষেত্র নয়, বরং একটি ভাগ করা সামাজিক উদ্যোগ যা কেবল তখনই সমৃদ্ধ হয় যখন নাগরিকরা সমালোচনামূলক এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এর সাথে জড়িত হয়।

ভারত যখন India@2047 এর দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন জাতীয় বিজ্ঞান দিবসকে একদিনের পালনীয় আচার হিসেবে নয়, বরং একটি কৌশলগত ও নৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত—যা অতীতের উৎকর্ষতাকে বর্তমান দায়িত্ব এবং ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে সংযুক্ত করে। এটি নীতিনির্ধারকদের মনে করিয়ে দেয় যে বিজ্ঞানে বিনিয়োগ পরীক্ষাগার এবং পরিকাঠামোতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং শিক্ষা, যোগাযোগ এবং প্রচারণার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হওয়া উচিত। এটি শিক্ষকদের মনে করিয়ে দেয় যে কৌতূহল এবং কল্পনা পাঠ্যক্রম এবং মূল্যায়নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

রামনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি কেবল তার নোবেল পুরস্কার স্মরণ করার মধ্যেই নয়, বরং কৌতূহল, যোগাযোগ এবং জনসাধারণের সম্পৃক্ততার সংস্কৃতি বজায় রাখার মধ্যেই নিহিত—যা বিজ্ঞানকে সমাজের সেবায় তার সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করে।

ডঃ নকুল পারাশর

বাংলা বিজ্ঞান কথা

Feb 2026 | Vol. IV | Issue 2

উপদেষ্টামণ্ডলী

স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক

ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী

ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

'বাংলা বিজ্ঞান কথা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তি তে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনমুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক

রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118

এবং

শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

বিজ্ঞান সংবাদ

কাছাকাছি নক্ষত্রের বিশাল মহাজাগতিক সংঘর্ষ

সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিকটবর্তী নক্ষত্র ফোমালহাউটের চারপাশে বৃহৎ পাথুরে এবং বরফের বস্তুর মধ্যে দুটি বিশাল সংঘর্ষের পরের ঘটনা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা আমাদের সৌরজগতের বাইরে একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কার। প্রাথমিক অবস্থায়

গ্রহ ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল ছিল, ধূমকেতু এবং গ্রহাণুগুলির মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষের ঘটনা ছিল খুবই সাধারণ, তবে খুব বড় সংঘর্ষ বিরল বলে মনে করা হয়েছিল। তবুও মাত্র 20 বছরের মধ্যে ফোমালহাউটের চারপাশে এই জাতীয় দুটি ঘটনা সনাক্ত করা হয়েছিল, প্রথমটি 2004 সালে এবং আবার 2023 সালে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ বিশেষ অপ্রত্যাশিত নয়। পৃথিবী থেকে মাত্র 25 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং প্রায় 44 কোটি বছর পুরানো তারা ফোমালহাউটকে সৌরজগতের প্রাথমিক অবস্থার বর্তমান ছবি বলে মনে করা যেতে পারে। হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর চারপাশের আলোকের উজ্জ্বল বিন্দুগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন যা প্রাথমিকভাবে গ্রহ বলে মনে হয়েছিল। আরও বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এগুলি আসলে কমপক্ষে 60 কিলোমিটার প্রশস্ত গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধূলিকণার মেঘ। একটি অনুমিত গ্রহ, ফোমালহাউট বি, পরে অদৃশ্য হয়ে যায় যা ধুলো-মেঘের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। আরো উজ্জ্বল একটি নতুন মেঘ এই সিদ্ধান্তকে আরও বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে লক্ষ লক্ষ অনুরূপ বস্তু নক্ষত্রটিকে প্রদক্ষিণ করছে। হাবল এবং জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে চলমান পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতে এই মেঘগুলিকে ট্র্যাক করবে এবং ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংঘর্ষের ধ্বংসাবশেষ থেকে আসল বহির্গ্রহের পার্থক্য নির্ণয় করতে সহায়তা করবে। ●

টিউমার ধ্বংসকারী ক্যান্সারের ওষুধ

কয়েক দশক ধরে হতাশাজনক ফলাফলের পর, CD40 রিসেপ্টরকে লক্ষ্য করে একটি নতুনভাবে তৈরি ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপি আসার আলো দেখাচ্ছে। CD40 অ্যাগোনিস্ট অ্যান্টিবডিগুলি একসময় প্রাণীদের মধ্যে শক্তিশালী অ্যান্টি-টিউমার প্রভাব তৈরি করত কিন্তু মানুষের মধ্যে গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে এর প্রয়োগের সুফল ছিল সীমিত। 2018 সালে

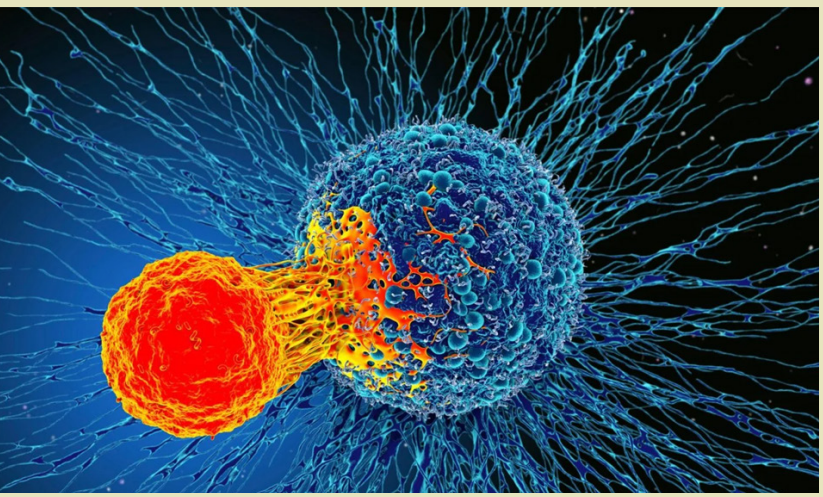

জেফ্রি র‍্যাভেচ এবং রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরা 2141-V11 নামে একটি আরও শক্তিশালী CD40 অ্যান্টিবডি তৈরি করেছিলেন এবং এটি প্রয়োগ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছিলেন—এটি শিরাপথে নয় বরং সরাসরি টিউমারে ইনজেকশন দেওয়া হতো। সম্প্রতি *ক্যান্সার সেল* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ফেজ 1 ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ফলাফলে মেলানোমা, স্তন ক্যান্সার এবং রেনাল সেল কার্সিনোমার মতো উন্নত ক্যান্সারে আক্রান্ত 12 জন রোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ছয়জন রোগীর মধ্যে টিউমারের সংকোচন ঘটে এবং দুটি ক্ষেত্রে টিউমার সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, যে টিউমারগুলিকে ইনজেকশন দেওয়া হয়নি সেগুলিরও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, যা একটি বিরল সিস্টেমিক ইমিউন প্রতিক্রিয়া দেখায়। কোনও রোগীই পূর্ববর্তী CD40 ওষুধের সাথে দেখা গুরুতর বিষাক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনুভব করেননি। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে চিকিৎসা করা টিউমারগুলি লিম্ফ নোডের মতো কাঠামো উৎপন্নকারী ইমিউন কোষ দিয়ে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যা টারশিয়ারি লিম্ফয়েড স্ট্রাকচার নামে পরিচিত এবং উন্নত ইমিউনোথেরাপি ফলাফলের সাথে যুক্ত। কোন রোগীরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া বাড়ানো যাবে তা সনাক্ত করার জন্য এখন বৃহত্তর পরীক্ষা চলছে। ●

দাবানলের ধোঁয়া বিপজ্জনক হতে পারে

সম্প্রতি এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, বনাঞ্চলের আগুন থেকে সৃষ্ট দূষণ পূর্বের অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। *এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি*-তে প্রকাশিত এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বজুড়ে দাবানল এবং নিয়ন্ত্রিত অগ্নিসংযোগ থেকে আগের অনুমানের চেয়ে প্রায় 21% বেশি জৈব গ্যাস নির্গত হয়। এই ফলাফল বায়ু দূষণের একটি উপেক্ষিত উৎসকে তুলে ধরে, যা মানুষের স্বাস্থ্য, বায়ুর গুণমান এবং জলবায়ুকে প্রভাবিত করতে পারে। যখন গাছপালা পোড়ে, তখন তা থেকে উদ্বায়ী জৈব যৌগ (VOCs) সহ বিভিন্ন গ্যাস এবং কণার মিশ্রণ নির্গত হয়। এই গবেষণায় মধ্যম- এবং অর্ধ-উদ্বায়ী জৈব যৌগ (IVOCs এবং SVOCs)-এর গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা পরিমাপ করা কঠিন এবং প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। এই যৌগগুলো বায়ুমণ্ডলে আরও সহজে সূক্ষ্ম কণা তৈরি করতে পারে, যা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। গবেষকরা 1997 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী দাবানলের তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের গাছপালা থেকে নির্গমনের পরিমাণ অনুমান করার জন্য বাস্তব জগতের পরিমাপের সাথে পরীক্ষাগারের প্রাপ্ত ফলাফলকে একত্রিত করেছেন। তারা দেখেছেন যে, বনাঞ্চলের আগুন প্রতি বছর গড়ে 143 মিলিয়ন টন জৈব যৌগ বাতাসে নির্গত করে। যদিও সামগ্রিকভাবে মানুষের কার্যকলাপ এখনও দূষণের প্রধানতম কারণ, তবে আগুন থেকে প্রায় একই পরিমাণ IVOCs এবং SVOCs নির্গত হয়। জঙ্গলে আগুন লাগা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। ফলে নিরক্ষীয় এশিয়া, আফ্রিকার উত্তর গোলার্ধের অংশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো অঞ্চলগুলো আগুন এবং মানুষের উৎস থেকে সৃষ্ট দূষণের সম্মিলিত প্রভাবে জটিল বায়ু মানের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

বর্জ থেকে সবুজ শক্তি উৎপন্নকারী অনুঘটক

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় গবেষকরা নবায়নযোগ্য উদ্ভিজ্জ বর্জ্য থেকে একটি নতুন, টেকসই অনুঘটক তৈরি করেছেন, যা বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন উৎপাদনকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। এই উপাদানটি তৈরি করা হয়েছে লিগনিন থেকে প্রাপ্ত কার্বন ফাইবারের মধ্যে নিকেল অক্সাইড এবং আয়রন অক্সাইড ন্যানোকণা স্থাপন করে। লিগনিন হলো কাগজ এবং বায়োরিফাইনারি শিল্পের একটি সাধারণ উপজাত। এই কাঠামোটি অক্সিজেন ইভোলিউশন রিঅ্যাকশন (OER) প্রক্রিয়াকে উন্নত করে, যা জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের একটি প্রধান দক্ষতাগত প্রতিবন্ধকতা। NiO/Fe_3O_4@LCFs নামক এই অনুঘটকটি 10 mA cm^2 কারেন্ট ঘনমাত্রায় 250 mV-এর একটি কম ওভারপোটেনশিয়াল অর্জন করে এবং উচ্চ কারেন্ট ঘনমাত্রায় 50 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্থিতিশীল কার্যকারিতা বজায় রাখে। এর নাইট্রোজেন-ডোপড কার্বন ফাইবার নেটওয়ার্কটি বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা উন্নত করে, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়ায় এবং ধাতব কণাগুলোকে একত্রিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। উচ্চ-রেজোলিউশনের ইমেজিংয়ে নিকেল এবং আয়রন অক্সাইডের মধ্যে একটি ন্যানোস্কেল হেটেরোজংশন দেখা যায়, যা বিক্রিয়ার মধ্যবর্তী পদার্থগুলোর শোষণ এবং নিঃসরণকে অনুকূল করার মাধ্যমে OER প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। ইলেকট্রোকেমিক্যাল পরীক্ষাগুলো থেকে জানা যায় যে, এই অনুঘটকটি একক-ধাতব বিকল্পগুলোর চেয়ে ভালো কাজ করে এবং এর টাফেল স্লোপ প্রতি দশকে মাত্র 138 mV, যা দ্রুত বিক্রিয়া গতিবিদ্যা নির্দেশ করে। রামন বিশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক গণনার দ্বারা সমর্থিত এই গবেষণাটি শিল্পক্ষেত্রে হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য মূল্যবান ধাতব অনুঘটকের একটি পরিমাপযোগ্য, স্বল্প-ব্যয়ী এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প তুলে ধরে।

চল্লিশ বছরে পা রাখল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনা

ভূপতি চক্রবর্তী

দেখতে দেখতে চল্লিশ বছর হয়ে গেল, আমরা জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন করছি। 1986 সালে এই বিষয়ে পরামর্শটা এসেছিল ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অন্তর্গত একটি সংস্থা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কম্যুনিকেশান (National Council of Science and Technology Communication বা NCSTC) থেকে। NCSTC সেইসময় লক্ষ করে যে, অল্প কিছু দেশের নিজস্ব একটি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস রয়েছে। সচরাচর সেই দেশের কোন নামী বিজ্ঞানীর জন্মদিনের সঙ্গে কিংবা তাদের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেই দিনটি। সম্ভবত বিষয়টি মাথায় রেখে NCSTC সুপারিশ করে যে কোন বিশেষ বিজ্ঞানীর জন্মদিন নয়; আধুনিক সময়ে কোন ভারতীয় বিজ্ঞানীর কোন বিশেষ অবদানকে ভিত্তি করে চিহ্নিত হোক জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে 1928 সালের একটি দিন, রামন ক্রিয়া আবিষ্কারের দিনটি। ভারত সরকার তা গ্রহণ করে এবং 1987 থেকে আমাদের দেশে সালে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন শুরু হয়। আঠাশে ফেব্রুয়ারি চিহ্নিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে। এই বছর (2026) সেই উদযাপনার চল্লিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে।

তাই আমাদের দেশের বিজ্ঞান দিবস অনেকটাই আলাদা ভাবে চিহ্নিত হয়েছে। 1928 সালের ওইদিন কোলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অব সায়েন্স (Indian Association for the Cultivation of Science বা IACS) এর গবেষণাগারে রামন পেলেন তার কাঙ্খিত বর্ণালির সন্ধান। প্রতিষ্ঠনটি তখন আজকের মত দক্ষিণ কোলকাতার যাদবপুরে নয়, সেটি অবস্থিত ছিল মধ্য কোলকাতা অঞ্চলে, বৌবাজার স্ট্রিটে। আমরা জানি যে, রামনের আবিষ্কৃত বর্ণালির পরিচিতি তার নামানুসারে রামন বর্ণালি হিসেবে। আর সামগ্রিকভাবে পরিঘটনাটি চিহ্নিত হলো, রামন ক্রিয়া (Raman Effect) হিসেবে। এই কাজে তার সঙ্গে ছিলেন তার মেধাবী ছাত্র, কারিয়ামানিক্কম শ্রীনিবাস কৃষ্ণান, যিনি কে এস কৃষ্ণান নামে পদার্থবিদ মহলে অধিক পরিচিত। বস্তুত যে সংক্ষিপ্ত পেপারটিতে এই অসাধারণ মৌলিক আবিষ্কারের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয় তার লেখক রামন একা ছিলেন না, সেখানে দ্বিতীয় লেখক ছিলেন কৃষ্ণান। তবে সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণ ছিল কৃষ্ণানের শিক্ষাগুরুর।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রামন সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের স্যার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত, যা অনেক সময়েই কেবলমাত্র উপাধির সূত্রে এখন পালিত অধ্যাপক নামে উল্লিখিত হয়। স্যার তারকনাথ পালিতের আর্থিক অনুদানে তৈরি পদার্থবিদ্যা বিভাগের ওই পদটি প্রথম অলঙ্কৃত করেন স্যার সি ভি রামন। 1917 সালে তিনি সরকারি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তুলনায় অনেক কম বেতনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন, মূলত গবেষণায় বেশি সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এর পিছনে ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্নাতকোত্তর বিভাগের ল্যাব তখন ততটা উন্নত ছিল না। কিন্তু রামন অনেকদিন ধরেই ‘কাল্টিভেশান’ এর যে গবেষণাগার ব্যবহার করে কাজ করছিলেন তা একদিকে ছিল অনেকটাই তার নিজ হাতে গড়া এবং তার নিজস্ব গবেষণাকাজের উপযোগী। IACS ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে রামন ছিলেন অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। কেবল আমাদের দেশে নয়, আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে রামন ছিলেন একজন অত্যন্ত উঁচু মাপের পরীক্ষণভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞানী। এদেশে সেই সময়কার সীমিত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বিষয় মাথায় রাখলে রামনের এই প্রয়াস কতটা উঁচু মানের ছিল তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করার দাবী রাখে।

আজ রামন বর্ণালি আবিষ্কারের প্রায় এক’শ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের সকলের মনে সম্ভবত কিছুটা বিস্ময় জাগবে যে রামনের মত এত বড়মাপের পদার্থবিদের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল এক ভিন্ন খাতে। অত্যন্ত প্রতিভাবান মেধাবী এক ছাত্র মাত্র উনিশ বছর বয়সে তৎকালীন মাদ্রাজ বা আজকের চেন্নাই থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হয়ে উত্তীর্ণ হলেন

স্যার সি ভি রামন

কে এস কৃষ্ণান

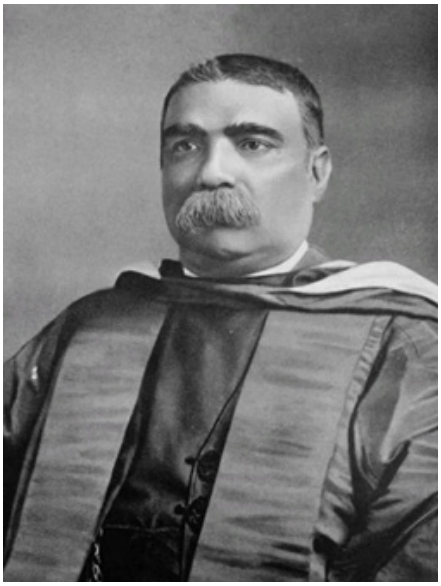
স্যার আশুতোষ মুখার্জী

এক যথেষ্ট কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়। সেটা 1907 সাল। কোলকাতা তখনও ইংরেজ শাসিত ভারতের রাজধানী। ভারতের অডিট ও অ্যাকাউন্টসের সার্ভিসের অফিসার হিসেবে যোগ দিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল পদে। তার প্রথম পোস্টিং হল তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতায়। পরবর্তীকালে অফিস-যাত্রার পথে সেই সময় বৌবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত IACS এর নামাঙ্কিত একটি বোর্ড কীভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং সেখানে তিনি হাজির হয়ে কীভাবে তৎকালীন সম্পাদক অমৃতলাল সরকারের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং তার সরকারী দায়িত্বের পরবর্তী সেখানে সময়ে গিয়ে রামন তার প্রিয় বিষয় পদার্থবিদ্যার চর্চা কীভাবে শুরু করলেন, কীভাবে গবেষণাগার গড়ে তুললেন তা বহু আলোচিত, বহু চর্চিত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অমৃতলাল সরকার ছিলেন কাল্টিভেশান অব সায়েন্স এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র। তার কয়েক বছর আগে ডাঃ সরকার প্রয়াত হছেন এবং তার পুত্র গ্রহণ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকের দায়িত্ব। এই 2026 সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অব সায়েন্স সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ করছে। এই ঘটনা 2026 সালের বিজ্ঞান দিবসে যুক্ত করেছে একটি অতিরিক্ত মাত্রা।

আমরা সকলেই জানি যে রামন 1930 সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারে ভুষিত হন। বস্তুত এশিয়া মহাদেশের থেকে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানের কোন একটি শাখায় নোবেল জয় করেন। এই পুরস্কার তিনি এককভাবে পান ওই বছর। সর্বাপেক্ষা বেশি মনোনয়নও তিনি পেয়েছিলেন ঐ 1930 সালে। মনে হয়, পুরস্কারের জন্য তাকে বেছে নিতে পদার্থবিদ্যার জন্য যে নোবেল কমিটি রয়েছে তার সদস্যদের বিশেষ অসুবিধা হয় নি, কারণ

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য কাল্টিভেশান অফ সায়েন্সঃ এর পুরোনো (বাঁয়ে) ও নতুন ক্যাম্পাস

নীলস বোর

হিদেকি ইউকাওয়া

ওই বছরে অন্য যারা মনোনীত হয়েছিলেন তাদের তুলনায় রামন অনেকটাই শক্তিশালী দাবীদার ছিলেন। আর রামনের সুপারিশকারীদের তালিকায় যে বিজ্ঞানীরা ছিলেন তাদের বেশ কয়েকজন তার আগেই নোবেল জয় করেছেন। রামন 1929 সালেও এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। সেই বছর তার নামে মনোনয়নপত্র পাঠিয়েছিলেন নীলস বোর। বোর অবশ্য আরও কিছু প্রথম সারির বিজ্ঞানীর মত 1930 এও রামনের নাম সুপারিশ করেন। রামনের সমসাময়িক আরও প্রতিভাধর ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথা আমরা জানি। তাদের অনেকেই বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, স্বীকৃতি পেয়েছেন কিন্তু নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতি মেলে নি। এখানেই রামন অনন্য।

তার প্রথম জীবনে সরকারি উঁচু পদে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা রামনের ছিল, সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী, তার কাজে ছিল সুপরিকল্পনার স্পষ্ট ছবি। মনে রাখতে হবে এশিয়া থেকে বিজ্ঞানের কোন শাখায় পরবর্তী নোবেলজয়ীকে পাওয়া গিয়েছিল রামনের নোবেলের উনিশ বছর পরে, 1949 সালে। ওই বছর জাপানি পদার্থবিদ হিদেকি ইউকাওয়া পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয় করেন। রামনের মত তিনিও এই পুরস্কার পান এককভাবে। এবং রামনের মতই তখন তার বয়স ছিল বিয়াল্লিশ।

বহু দেশ অবশ্য ইউনেস্কো প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য চিহ্নিত দিবসকে গ্রহণ করেছে তাদের দেশের বিজ্ঞান দিবস হিসেবে। দিনটি হলো দশই নভেম্বর। 2001 সালে এটি গৃহীত হয় এবং তার পর থেকে নানা দেশে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। 1999 সালে হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ট শহরে সংগঠিত হয়, প্রথম ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, কতকটা বসুন্ধরা সম্মেলনের ধাঁচে। সারা বিশ্বের বহু দেশের প্রতিনিধিরা সেই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে যেমন সরকারি প্রতিনিধিরা ছিলেন, তেমনই ছিলেন অসরকারি ক্ষেত্রের কর্মী তথা প্রতিনিধিরা। এই দলের মানুষেরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করছেন জনমানসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক চিন্তাভাবনা প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করছেন।

আঠাশে ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান দিবস হিসেবে আমাদের মধ্যে যখন প্রতি বছর ফিরে আসে, আমরা যারা প্রত্যক্ষভাবে গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নই, কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহী, যে আগ্রহ কেবল তাদের বিকাশ ঘিরে নয়, যে আগ্রহ তার সঙ্গে জুড়ে থাকা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে, আমাদের ভাবায়। সেই ভাবনাগুলো আরেকবার গুছিয়ে নিয়ে শুরু হয় পথচলা। কেউ মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন বক্তৃতা, কেউবা পত্রপত্রিকায় লিখতে পছন্দ করেন, কেউবা ছোট ভিডিও বানিয়ে পৌঁছে যান আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে। বিজ্ঞান দিবসের মধ্যে আদতে বিজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করে, প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে বার্তা—'শতফুল বিকশিত হোক'। প্রসারিত হোক বিজ্ঞানের দিগন্ত, কেবল গবেষণাগারে নয় আমাদের রোজকার জীবনে, আমাদের কর্মক্ষেত্রে, বৃহত্তর সমাজে, আর সর্বস্তরে। ●

লেখক ***ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী*** *কলকাতার সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabhu@gmail।com

বিজ্ঞান সঞ্চার—বিজ্ঞান থেকে জনমত পর্যন্ত

নকুল পারাশর

ভারতে বিজ্ঞান সঞ্চারের ইতিহাস দীর্ঘ, বহুপথগামী এবং গভীরভাবে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এটি কেবল জ্ঞানের আদান-প্রদানের ইতিহাস নয়, বরং ক্ষমতা, সংস্কৃতি, প্রতিরোধ এবং আত্মপরিচয় নির্মাণেরও এক দীর্ঘ যাত্রা। যদিও পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ধারণার আদান-প্রদান সপ্তদশ শতক থেকেই শুরু হয়েছিল, তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রকৃত অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রূপ নিতে শুরু করে। এই সময়টি ছিল উপনিবেশবাদী শাসনের বিস্তার, প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ এবং সমাজের গভীর রূপান্তরের যুগ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং এমন এক প্রযুক্তিগত ও জ্ঞানভিত্তিক পরিকাঠামোও নিয়ে আসে, যার মাধ্যমে ধারণা ও তথ্য দ্রুত চলাচল করতে থাকে। এর মধ্যে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, খ্রিস্টান মিশনারি এবং কিছু ভারতীয় উদ্যোগে কলকাতা, মাদ্রাজ ও অন্যান্য অঞ্চলে ছাপাখানা গড়ে ওঠে। এর ফলে বই প্রকাশ একটি সীমিত অভিজাত কার্যকলাপ থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে। এই সময়ে প্রকাশিত বহু বই ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক। গ্রন্থপঞ্জিগত অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশটি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, যা ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান সঞ্চারের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করে।

তবে এই জ্ঞানপ্রবাহ নিরপেক্ষ ছিল না। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ক্রমে উপনিবেশিক শাসকে পরিণত হয় এবং ভারতীয় সমাজের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা, ভাষা ও বিজ্ঞান তখন নিছক জ্ঞানচর্চার বিষয় না থেকে ক্ষমতা প্রয়োগের হাতিয়ারে পরিণত হয়। উনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকে শিক্ষানীতি নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়, তা আসলে জ্ঞানের ওপর কার অধিকার থাকবে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। একদল ব্রিটিশ নীতিনির্ধারক প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহী ছিলেন, অন্য দল ইংরেজি মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রচারের পক্ষে সওয়াল করেন।

1835 সালে টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকাওলির ‘মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন’ এই বিতর্কে একটি ঐতিহাসিক মোড় এনে দেয়। এই নথিতে ইউরোপীয় জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞানব্যবস্থাকে তুচ্ছ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও এর ফলে ইংরেজি মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসার লাভ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান পাঠক্রম গড়ে ওঠে, একই সঙ্গে এটি ভারতীয় সমাজে গভীর সাংস্কৃতিক আঘাত হানে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ জন্মায়; অনেকেই এটিকে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যকলাপের আড়াল হিসেবে দেখেন। বিশেষত উত্তর ও মধ্য ভারতে এই প্রতিরোধ ছিল তীব্র।

অন্যদিকে, সমাজসংস্কারক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ উপলব্ধি করেন যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ত না করলে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অসম্ভব। এই উপলব্ধি থেকেই

অনুবাদ আন্দোলনের সূচনা ঘটে। দিল্লি কলেজ ভার্নাকুলার ট্রান্সলেশন সোসাইটি উর্দু ভাষায় বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থ অনুবাদ করে। হায়দরাবাদের মতো দেশীয় রাজ্যগুলিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিতের গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য বিশেষ মুদ্রণালয় ও অনুবাদ ব্যুরো গড়ে ওঠে। এই উদ্যোগগুলো দেখায় যে ভারতীয় সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং একে নিজের সাংস্কৃতিক পরিসরে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছে।

এই সময়েই উপনিবেশিক শোষণের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। 1857 সালের বিদ্রোহ ছিল এই দীর্ঘ ক্ষোভের বিস্ফোরণ। যদিও বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় এবং তার পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শাসন আরও কঠোর হয়ে ওঠে, তবু এই ঘটনা ভারতীয় সমাজকে এক গভীর আত্মসমালোচনার দিকে ঠেলে দেয়। অনেকেই উপলব্ধি করেন যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়াই ছিল পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

উনবিংশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদ ক্রমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুঝতে পারে যে ভাষা, ধর্ম ও জাতিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে একটি সর্বভারতীয় পরিচয় নির্মাণ করতে হলে আধুনিক ধারণাগুলোর আশ্রয় নিতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সমতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—এই সব ধারণা জনপরিসরে প্রবেশ করে। এই প্রেক্ষাপটে জওহরলাল নেহরু ‘বিজ্ঞানমনস্কতা’ বা scientific temper ধারণাটিকে সামনে আনেন, যা যুক্তিবাদী চিন্তা, প্রমাণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কুসংস্কারমুক্ত মননের প্রতীক হয়ে ওঠে।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সি ভি রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হোমি ভাবা, শ্রীনিবাস রামানুজন, মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা করেন এবং একই সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীরভাবে ভাবেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, স্বাধীন ভারতকে এগিয়ে নিতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিপুল বিনিয়োগ এবং একটি বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন সমাজ গড়ে তোলা অপরিহার্য।

1947 সালে স্বাধীনতার পর এই ধারণাগুলো রাষ্ট্রনীতির অংশে পরিণত হয়। গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যাপক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। CSIR, DRDO, পারমাণবিক শক্তি কমিশন, ISRO এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে, পুরোনো প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা হয়। একই সঙ্গে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি পায়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, বিভিন্ন বিজ্ঞান একাডেমি, জাদুঘর ও প্ল্যানেটোরিয়াম গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান সঞ্চারের জন্য বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা এই ক্ষেত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

তবুও এই প্রচেষ্টাগুলোর একটি সীমাবদ্ধতা ছিল। এগুলো মূলত শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে মনোযোগী ছিল। সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানচর্চা তখনও অনেকাংশে উপেক্ষিত থেকে যায়। এই প্রেক্ষাপটেই পিপলস সায়েন্স মুভমেন্টের উদ্ভব ঘটে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সমাজসংস্কারকেরা উপলব্ধি করেন যে বিজ্ঞানকে

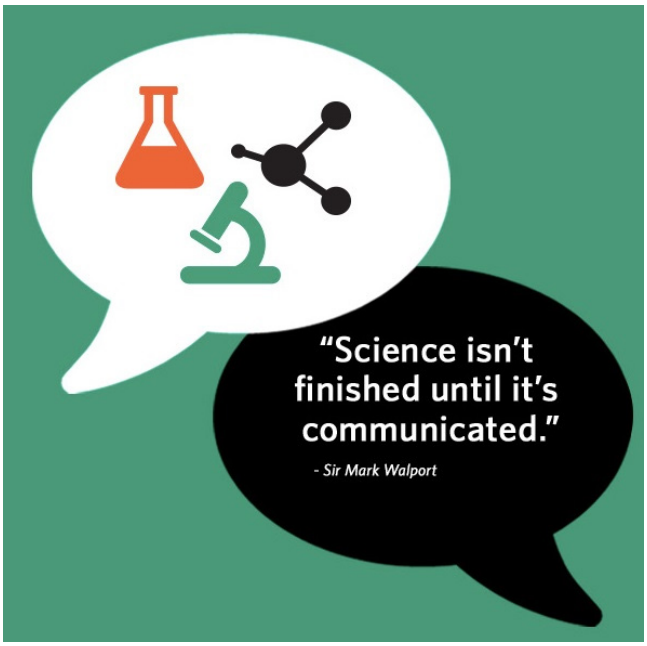

মানুষের মাতৃভাষায়, তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মাধ্যমের মাধ্যমে না পৌঁছালে প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

1960-এর দশকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশব্যাপী রূপ নেয়। নাটক, গান, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞান মেলা, বক্তৃতা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে বিজ্ঞান পৌঁছে দেওয়া হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় ভারতে জনসাধারণের বিজ্ঞান-বোঝাপড়া বা Public Understanding of Science (PUS) গবেষণা। পশ্চিমা দেশগুলির মতো কেবল ‘কতটা জানে’ তা মাপার বদলে, ভারতীয় গবেষণা জোর দেয় মানুষ কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে এবং কেন কিছু ধারণা সহজে গ্রহণযোগ্য হয় আর কিছু হয় না।

এই গবেষণা থেকে ‘কালচারাল ডিস্ট্যান্স মডেল’-এর বিকাশ ঘটে, যা বিজ্ঞান ও জনমানসের মধ্যবর্তী সাংস্কৃতিক দূরত্বকে বিশ্লেষণ করে। এই মডেল দেখায় যে বিজ্ঞান সঞ্চার কেবল শিক্ষার মাত্রার ওপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে জড়িত দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ধারণার সম্পর্ক, জটিলতা, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা এবং সাংস্কৃতিক বিশ্বাস। এই উপলব্ধি বিজ্ঞান যোগাযোগকে একটি গভীর সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে বুঝতে সাহায্য করে।

ভারতের পঁচিশ বছরের PUS গবেষণা আমাদের শেখায় যে বিজ্ঞান যোগাযোগের লক্ষ্য কখনওই সকলকে সমানভাবে সব বিজ্ঞান শেখানো হতে পারে না। বরং লক্ষ্য হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ—যার মধ্যে যুক্তিবাদ, প্রশ্ন করার ক্ষমতা, প্রমাণকে গুরুত্ব দেওয়া এবং পরিবর্তনের প্রতি উন্মুক্ত মনোভাব অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কী জানে না, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষ কীভাবে ভাবে। এই সত্য উপলব্ধি করলেই বিজ্ঞান যোগাযোগ প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমাজ-রূপান্তরমুখী হয়ে উঠতে পারে। ●

*লেখক **ডঃ নকুল পারাশর** শান্তি ফাউন্ডেশনের মূল কর্মাধ্যক্ষ্য।*
ইমেল: nakul@shantifoundation.global

গ্রহান্তরে জীবনের সন্ধান

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আমরা, পৃথিবীর জীবরা কি মহাবিশ্বে একা? মহাকাশ থেকে কি কেউ আমাদের দেখছে? পৃথিবীর বাইরে কি জীবন আছে? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের প্রথমে তিনটি রহস্য বুঝতে হবে—প্রথমত জীবনের সংজ্ঞা, দ্বিতীয়ত জীবনের বিকাশের পূর্বশর্ত এবং তৃতীয়ত, পৃথিবীতে প্রথম অবস্থায় জীবন কীভাবে বিকশিত হয়েছে এবং কিভাবে তা টিকে আছে।

'জীবনের' সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে কী কী? চারপাশে তাকালে আমরা জীবনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারি—জীবন বৃদ্ধি পায়, জীবন প্রতিলিপি তৈরি করে, জীবন বিপাক ক্রিয়া ঘটায়, জীবন শক্তি সংগ্রহ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিবেশকে কাজে লাগায়, জীবন জটিলতার একটি স্তর প্রদর্শন করে যা এটিকে নির্জীব বস্তু থেকে আলাদা করে। জীবনের একটি পরিশীলিত ব্যবস্থা রয়েছে যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রেরণ করে। জীবন অভিযোজিত হয় এবং বিকশিত হয়। কিন্তু এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই যা নির্জীব বস্তুর মধ্যে নেই। লবণের স্ফটিকগুলি তাদের নিজস্বভাবে বৃদ্ধি পায়, কম্পিউটার প্রোগ্রাম প্রতিলিপি তৈরি এবং বিকশিত হতে পারে এবং কম্পিউটাররে তথ্য সংরক্ষণ এবং ভাগ করে নেওয়ার অত্যন্ত পরিশীলিত ব্যবস্থা রয়েছে। আগুন বিপাক ক্রিয়া করে, জ্বলনের মাধ্যমে শক্তি নির্গত করে। আবহাওয়া অবিশ্বাস্যভাবে জটিল আচরণ প্রদর্শন করে। তাই এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনওটিই জীবনকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য অনন্য নয়।

নাসার বিজ্ঞানী জেরাল্ড জয়েস ডারউইনের বিবর্তনের মাধ্যমে জীবনকে একটি স্বনির্ভর রাসায়নিক ব্যবস্থা হিসেবে একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু দর্শনের অধ্যাপক ক্যারল ক্লেল্যান্ড যেমন বলেছেন, জীবনকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য আমরা সম্ভবত এখনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি সঠিক ভাষা তৈরি করতে পারিনি, ঠিক যেমন জলের সঠিক সংজ্ঞার জন্য আণবিক রসায়ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রয়োজন। এখনো পর্যন্ত 'জীবনের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কার্যকরী সংজ্ঞা' হল জীবন্ত রূপ যা আণবিক কাঠামো তৈরি করতে শক্তি ব্যবহার করে এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্নিহিত নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী অনুসরণ করে নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করে।

বিজ্ঞানীরা অনেকাংশে একমত যে, যেকোনো জায়গায় জীবনের বিকাশের জন্য কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জলের উপস্থিতি। অধিকন্তু,

জীবনের জন্য উপযোগী একটি 'বাসযোগ্য অঞ্চল' থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ, মূল নক্ষত্র থেকে উপযুক্ত দূরত্বে একটি গ্রহ যেখানে সাধারণ তাপমাত্রা এবং চাপের অধীনে তরল অবস্থায় জল থাকতে পারে। এই বাসযোগ্য অঞ্চলটিকে বলা হয় সার্কমস্টেলার বাসযোগ্য জোন (CHZ)। কোথাও কোথাও এটি গোল্ডিলক্স জোন নামেও পরিচিত। এটি গোল্ডিলক্স এবং থ্রি বিয়ারের রূপকথা থেকে এসেছে। যেখানে একটি ছোট মেয়ে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে থেকে খুব বড়, খুব ছোট, অথবা খুব চরম জিনিসগুলোকে সরিয়ে রেখে 'সঠিক' জিনিসটি বেছে নেয়। জীবনের জটিলতা ধারণ এবং প্রতিফলিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জটিল জৈব অণু তৈরির জন্য আবশ্যিক জৈব উপাদানের প্রাচুর্যও থাকা একান্ত জরুরি। পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত পদার্থের নিরানব্বই শতাংশ মাত্র ছয়টি উপাদান দ্বারা গঠিত—কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস এবং সালফার (CHNOPS)। সমস্ত বিপাক-সক্ষম জীবের শরীরে জৈব অণুর মধ্যে এই উপাদানগুলি জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে যা একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে যেখানে এই অণুগুলির মধ্যে সহজেই রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে।

অন্য যেকোনো তরল পদার্থের তুলনায় জলের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে শক্তিশালী রাসায়নিক বন্ধনের কারণে তরল জল বিভিন্ন তাপমাত্রায় স্থিতিশীল থাকে। অধিকন্তু, বরফ কম ঘনত্বের হওয়ায় জলের উপর ভাসে—এর অর্থ হল তাপমাত্রা কমে গেলে মহাসাগরগুলির উপর থেকে জল জমে যায় এবং বরফের স্তরটি অন্তরক হিসাবে কাজ করে। নীচের জল জমে না, ফলে জীবন্ত প্রাণীরা সেখানে বেঁচে থাকতে পারে। বিপরীতে, অ্যামোনিয়া, যা –780 থেকে –330 সেলসিয়াস পর্যন্ত তরল থাকে, এবং আরো ঠান্ডায় নিচের থেকে ওপরের দিকে জমতে শুরু করে যা ওই তরলে বসবাসকারী সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। অন্যান্য তরল পদার্থ জলের মতো জীবনের জন্য অনুকূল নাও হতে পারে।

তরল জলের উপস্থিতি ছাড়াও, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিপাকের জন্য সূর্যালোকের মতো শক্তির একটি স্থির উৎস, যা একটি নক্ষত্র সরবরাহ করতে পারে। এই ধরনের শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকেও আসতে পারে; যা অন্তত তত্ত্বগতভাবে, ভূপৃষ্ঠের পরিবেশে জীবনের বিবর্তন সম্ভব করে তোলে। জৈব উপাদানের পুনর্নবীকরণযোগ্য সরবরাহ এবং স্থল বা সমুদ্রপৃষ্ঠের মতো কঠিন, তরল এবং গ্যাসের মধ্যে একটি স্থিতিশীল ইন্টারফেস জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তন কীভাবে হয়েছিল? যেমন জে ই লাভলক তার "Gaia: A New Look at Life on Earth" বইয়ে বলেছেন—জীবন ছিল "একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব ঘটনা যার প্রায় অসীম সম্ভাবনা রয়েছে।" পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তন সম্ভবত একটি দুর্ঘটনা হিসেবে ঘটেছে, একটি এলোমেলো ঘটনা যা আদিম মহাসাগরে কোটি কোটি বছরের পরিবর্তন এবং রূপান্তরের ফলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাসায়নিকের সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি, যার ফলে অবশেষে এমন একটি অণু তৈরি হয়েছিল যা নিজের প্রতিলিপি তৈরী করতে সক্ষম ছিল। আদিম মহাসাগরের নীল সবুজ জলে যেখানে প্রাণ সম্ভবত বিকশিত হয়েছিল, তার সেই জন্মস্থান থেকে এটি কোটি কোটি বছরের পরীক্ষা এবং ক্লেশের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বিলাসবহুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, রূপান্তরের অন্তহীন শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে অসংখ্য আকার এবং রূপ ধারণ করেছে।

একই প্রক্রিয়া গ্যাস এবং ধূলিকণার আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘেও ঘটতে পারত—সেখানে সরল অণু এবং উপাদানগুলি উপস্থিত এবং তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি কাছাকাছি কোনো একটি নক্ষত্রের শক্তি দ্বারা চালিত হতে পারত। প্রকৃতপক্ষে, 1968 সালে মাইক্রোওয়েভে রেডিও-জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশে অ্যামোনিয়া এবং জলীয় বাষ্প আবিষ্কৃত হয়েছিল। 1969 সালে, গ্যাস এবং ধূলিকণার আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘে আরেকটি জৈব অণু ফর্মালডিহাইড আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্পষ্টতই, যদি মাত্র 80 কোটি বছর অস্তিত্বের পরে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে পৃথিবীতে জীবন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে, তবে একই প্রক্রিয়াগুলি কয়েকশো কোটি বছর পুরানো আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই প্রক্রিয়াগুলি ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের ভিতরেও সক্রিয় হতে পারত, যেখানে তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলির ক্ষয় দ্বারা সরবরাহিত তাপ পৃথিবীর মতো সহজেই 'উষ্ণ ছোট পুকুর' তৈরি করতে পারত।

1969 সালের 28শে সেপ্টেম্বর তারিখে অস্ট্রেলিয়ার মারচিনসন নামক স্থানে একটি বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের আঘাত লাগে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাঁচটি অ্যামিনো অ্যাসিডের চিহ্ন ছিল—গ্লাইসিন, অ্যালামাইন, গ্লুটামিন, ভ্যালাইন এবং প্রোলিন, যা জৈবিক উৎস থেকে উৎপন্ন হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, এগুলি জৈব বিবর্তনের সরাসরি রাসায়নিক পূর্বসূরী হতে পারে। হয়তো এইভাবেই প্রাণের বীজ মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলো অপর একটি গ্রহ, উল্কাপিণ্ড বা অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর সংঘর্ষের বা পৃথিবীতে পতনের মাধ্যমে; হয়তো বা তারা সৌর বা নক্ষত্রীয় বায়ুর মাধ্যমেও পৃথিবীতে আসতে পারে। কিন্তু আদি জীবন্ত অণুগুলি যে রূপেই থাকুক না কেন, এবং যেখান থেকেই আসুক না কেন, বর্তমানে যে ধরণের জীবনের রূপের সাথে আমরা পরিচিত, তারা ছিল তার থেকে অনেক দূরে। প্রাণের প্রাথমিক রূপ থেকে বর্তমান রূপে আসার পিছনে আছে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ইতিহাস। চেতনা এবং বুদ্ধিমত্তার বিবর্তনে এখনও আরও অনেক লক্ষ বছর সময় লাগবে।

অনেকের মতে, প্রাণ ছিল পৃথিবীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীর ভূত্বক শক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আদিম জীবনের আবির্ভাব ঘটে। গ্রিনল্যান্ড থেকে কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমির রেখায়, যাকে উত্তর আটলান্টিক ক্র্যাটন বলা হয়, সেখানে এই গ্রহের সবচেয়ে প্রাচীন কিছু শিলা তৈরি হয়েছে, যা প্রায় 380 কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছিল। গ্রিনল্যান্ডের অভ্যন্তরে ইসুয়া সুপ্রাক্রাস্টাল বেল্ট হল এমন একটি স্থান, যেখানে পাললিক শিলাগুলি দীর্ঘ সময় ধরে সমাহিত ছিল এবং রূপান্তরিত হয়েছিল। এই শিলাগুলিতে খনিজ গ্রাফাইট পাওয়া গেছে—কার্বনের একটি রূপ যা কেবল দুটি উৎস থেকে আসতে পারে: আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত আদিম অজৈব কার্বন অথবা সমুদ্রের তলে জৈব পদার্থের সমাহিত অবশিষ্টাংশ থেকে জৈব কার্বন। কার্বনের দুটি স্থিতিশীল আইসোটোপ রয়েছে, যাদের পারমাণবিক ওজন 12 এবং 13 (C^{12} এবং C^{13})। জীবন্ত জীবের টিস্যুতে C13 এর চেয়ে একটু বেশি C12 থাকে, কারণ C12, C13 এর চেয়ে বেশি বিক্রিয়াশীল। Isua-তে প্রাপ্ত গ্রাফাইট প্রায় 2 শতাংশ বেশি C12 সমৃদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে এর উৎপত্তি সামুদ্রিক জীবাণু থেকে, যা অবশ্যই মারা গিয়ে পলিতে সমাহিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সংকুচিত হয়ে এই পলির মতোই পুরনো গ্রাফাইটে রূপান্তরিত হয়। জীবনের উৎপত্তি এই গ্রহের প্রায় শুরুর সময় থেকে, অর্থাৎ এই পাথুরে গ্রহটি অস্তিত্বে আসার 80 কোটি বছরেরও কম সময়ের মধ্যে।

তখন সূর্যের উজ্জ্বলতা প্রায় এক-চতুর্থাংশ কম ছিল কারণ এর ফিউশন বিক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়নি। সূর্য তখন কম শক্তি উৎপাদন করত এবং ফলস্বরূপ পৃথিবীও কম শক্তি গ্রহণ করত। কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং মিথেন, যা নবজাত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে ছিল এবং ক্ষীণ তরুণ সূর্যের শক্তিকে আংশিকভাবে প্রতিহত করতো, যার ফলে হয়তো পৃথিবী একটি হিমায়িত গ্রহ হয়ে উঠতো যার সমস্ত পৃষ্ঠ পারমাফ্রস্টে রূপান্তরিত হত যা জীবনের বিবর্তনের জন্য অনুপযুক্ত। অধিকন্তু, ভূপৃষ্ঠের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে থাকা মহাসাগরগুলি ছিল অন্ধকার, তারা সূর্যালোক শোষণ করত। অন্যদিকে পাহাড়ের চূড়ার ওপর বরফের আবরণ যা সূর্যালোককে মহাকাশে প্রতিফলিত করে, তাও ছিল খুব কম। এইভাবেই তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় ছিল যা ছিল জীবনের বিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

280 কোটি বছর আগে পৃথিবীর ভূত্বকের বেশিরভাগ অংশ ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং মহাদেশগুলি তাদের চারপাশে বৃহৎ তাক অঞ্চলের বিকাশের সাথে সাথে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল। এই অঞ্চলগুলির আবহাওয়ার ফলে সমুদ্রে পুষ্টির ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে অণুবীক্ষণিক জীবের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। আর্কিয়ান যুগের শেষের দিকে, প্রায় 250 কোটি বছর আগে বায়ুমণ্ডল মূলত মিথেন দিয়ে গঠিত ছিল। তখন প্রতি 10 লক্ষ অংশ আণবিক মিথেনের সাপেক্ষে অক্সিজেনের পরিমান ছিল এক অংশেরও কম। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনেশন—যা 'মহান জারণ ঘটনা' বলে পরিচিত—তা ঘটেছিলো ধাপে ধাপে। প্রথমে 240 কোটি বছর আগে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় 2 শতাংশ, তারপর 7.5 কোটি বছর আগে 3 শতাংশে এবং অবশেষে 5.8 কোটি বছর আগে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় 10 শতাংশেরও বেশি। এই 'অক্সিজেনেশন' মূলত সমুদ্রপৃষ্ঠে সালোকসংশ্লেষ দ্বারা অক্সিজেন উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তনের ফলে ঘটেছিল, যা নীল সবুজ 'সায়ানোব্যাকটেরিয়া'র

পূর্বপুরুষ, যা আজ পৃথিবীর হ্রদ এবং মহাসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে রয়েছে। অক্সিজেনের এই বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই প্রাণের গতিকে জটিল 'বায়বীয়' বা অক্সিজেন-শ্বাস-প্রশ্বাসকারী জীবের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।

ততদিন পর্যন্ত জটিল পদার্থ ভেঙে এবং নির্গত শক্তি ব্যবহার করেই জীবনের অস্তিত্ব টিকে ছিল। আদিম অণুজীবের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত এই জটিল পদার্থগুলো সমুদ্রের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে তাদের সরল উপাদান থেকে পুনর্গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন তৈরি হওয়ার পর অক্সিজেন অণুগুলি সূর্যালোকের মাধ্যমে অক্সিজেন পরমাণুতে বিভক্ত হয় এবং অক্সিজেনের অপর অণুর সাথে মিলিত হয়ে ওজোন তৈরি করে। নির্গত ওজোন বায়ুমণ্ডলের উপরে ওজোন স্তর তৈরি করে, যা সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। ওজোন স্তরটি ধ্বংসাত্মক অতিবেগুনী রশ্মি থেকে জীবনকে রক্ষা করেছিল যা এখনও করে, তার সাথে এটি জীবনের অণুগুলির জন্য খাদ্য তৈরিকারী অতিবেগুনী রশ্মিকে আটকে দিয়ে জীবনের বিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করে। রাসায়নিক খাদ্য সরবরাহের পুনঃপূরণ আর সম্ভব হয়নি, খাদ্যের জন্য জীবন্ত অণুগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। সমুদ্রে আদিম রাসায়নিক পদার্থ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নিজস্ব খাদ্য সংশ্লেষণে সক্ষম জীবগুলিকে বিবর্তিত হতে হয়েছিল এবং তখন শক্তির একমাত্র উৎস ছিল সূর্যালোক। যে জীবগুলি এই স্বল্প-শক্তির আলো ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব খাদ্য তৈরি করতে পারত তাদের এই শক্তি আটকে রাখার পদ্ধতি শিখতে হয়েছিল। তারা ছিল ক্লোরোফিল ধারণকারী মাইটোকন্ড্রিয়া-সদৃশ পদার্থ—নীল-সবুজ শৈবাল। এই সমুদ্র-বাসকারী জীবাণুগুলি সম্ভবত প্রথম কোষ, খুব সাধারণ 'প্রোক্যারিওটস'। আধুনিক উদ্ভিদ কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল ধারণকারী উপ-কোষীয় অঙ্গাণু 'ক্লোরোপ্লাস্ট' যেখানে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে, এগুলি ছিল তার পূর্বপুরুষ।

প্রাচীন সমুদ্রে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নীল সবুজ শৈবাল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আণবিক অক্সিজেন তৈরির জন্য বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করতে শুরু করে, যা ধীরে ধীরে স্থলজ বায়ুমণ্ডলকে রূপান্তরিত করে। এই শৈবাল দ্বারা নিঃসৃত চুন সূর্যালোক গ্রহণকারী অগভীর মহাসাগরে জমা হত, যা স্ট্রোমাটোলাইট নামক প্রথম জীবন-সৃষ্ট কাঠামো তৈরি করত। সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে এই স্ট্রোমাটোলাইটের উপর অক্সিজেনযুক্ত বুদবুদ তৈরি হত, তারপর ধীরে ধীরে সূর্য-স্নাত মহাসাগরের পৃষ্ঠে উঠে জল থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে মুক্ত করত। বায়ুমণ্ডল অক্সিজেনযুক্ত হয়ে গেলে এবং ওজোন স্তর সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়ে গেলে জীবের জন্য সমুদ্রের পৃষ্ঠে বসবাস করা এবং অবশেষে তাদের জলীয় আবাসস্থল থেকে স্থলে আসা নিরাপদ হয়ে উঠলো, যা বায়বীয় প্রাণীর বিবর্তনের সূচনা করেছিল। এই সময় থেকে জীবন রূপের বিবর্তন দুটি স্বতন্ত্র দিকে এগিয়ে যায়—একটি অক্সিজেন-শ্বাস-প্রশ্বাসকারী এবং দ্রুত-গতিতে বিকশিত হয়ে বায়বীয় জীবকুল গঠন করেছিল, এবং অন্যটি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণকারী অচল উদ্ভিদ রাজ্যে বিকশিত হয়। এই দুটি রূপের একে অপরের সাথে পরিপূরক এবং সিম্বিওটিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। অক্সিজেন নিঃসরণের ফলে পরিবেশের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা ছিল জীবনের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ধীরে ধীরে, সরল প্রোক্যারিওট থেকে, 'ইউক্যারিওট'—নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ গঠিত জীবগুলি বিবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে যৌন প্রজননের আবির্ভাব জৈবিক বিবর্তনের গতিকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করে, যা জীবনের বিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকে প্রায়

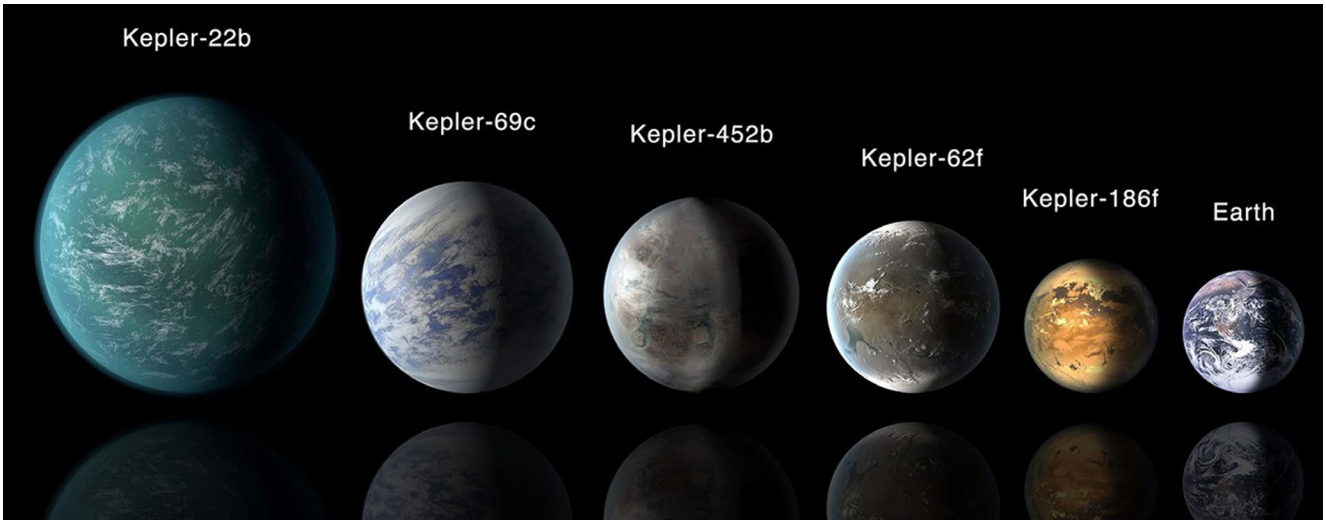

অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে এবং প্রজাতিকরণ, নতুন প্রজাতির গঠন, অসংখ্য রূপ এবং পৃথিবীতে জীবনের অদম্য বৈচিত্র্যের জন্ম দেয়।

জীবাশ্ম এবং অন্যান্য প্রমাণ দেখায় যে পৃথিবীতে প্রাণ অসাধারণভাবে স্থিতিস্থাপক ছিল এবং সবচেয়ে চরম পরিবেশ ধরে রেখেছিল। অ্যান্টার্কটিক বরফের প্রায় এক কিলোমিটার নীচে অবস্থিত হুইলান্স হ্রদ থেকে একটি জীবাণু উদ্ধার করা হয়েছিল। মেক্সিকোর একটি গুহায় 50 ফুট ভূগর্ভস্থ কার্বন মনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষাক্ত পরিবেশেও জীবাণুর উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। সমুদ্রের তলদেশে অতি উত্তপ্ত হাইড্রোথার্মাল ভেন্টগুলিতে ব্যাকটেরিয়ার সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় প্রতিটি চরম পরিবেশে, উষ্ণ প্রস্রবণ এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের গভীরে হিমশীতল হ্রদে, অত্যন্ত অ্যাসিডিক, ক্ষারীয় বা তেজস্ক্রিয় স্থানে—প্রায় প্রতিটি অকল্পনীয় পরিবেশে—জীবনের একককে বেঁচে থাকতে এবং বংশবিস্তার করতে দেখা গেছে। এটি কেবল নিশ্চিত করে যে এটি ছায়াপথের যে কোনও জায়গায় বিকশিত হতে এবং বৃদ্ধি পেতে পারে।

***

আসুন এখন আমাদের গ্রহের বাইরে তাকাই। আমাদের ছায়াপথের ভেতরে এবং বাইরে অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলে বাসযোগ্য অঞ্চলে পৃথিবীর মতো পাথুরে গ্রহ থাকতে পারে যেখানে প্রাণের জন্ম হতে পারে। বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতের বাইরে প্রায় 3400টি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন যাদেরকে 'এক্সোপ্ল্যানেট' বলা হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহির্গ্রহে প্রাণের কোনও প্রমাণ পাননি। বহির্গ্রহগুলি পরোক্ষভাবে উজ্জ্বলতা, অবস্থান ইত্যাদির মতো গ্রহের উপস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এমন নক্ষত্রীয় বৈশিষ্ট্য থেকে সনাক্ত করা হয়—আকাশে একটি নক্ষত্রের গতি পরিমাপ করে, নক্ষত্রীয় বর্ণালীর ডপলার স্থানান্তর পরিমাপ করে বা নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আলোক রশ্মির বাঁক ব্যবহার করে এই সনাক্তকরণ করা যায়। আবার এগুলিকে মহাকাশে টেলিস্কোপ দ্বারা সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও সনাক্ত করা যেতে পারে, যেমন হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (2001), স্পিটজার স্পেস টেলিস্কোপ (2003), করোট (2006) এবং কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ (2009)। প্রসঙ্গত 2015 সালের জানুয়ারী মাসে কেপলার টেলিস্কোপ আমাদের ছায়াপথে একটি পৃথিবীর মতো বহির্গ্রহ আবিষ্কার করে, যা তখন থেকে কেপলার 452বি এবং 'পৃথিবী 2.0' নামেও পরিচিত। 2015 সালের জুলাই মাসে পৃথিবী থেকে মাত্র 21 আলোকবর্ষ দূরে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে আরও তিনটি পৃথিবীর মতো পাথুরে বহির্গ্রহ আবিষ্কৃত হয়।

একবার একটি বহির্গ্রহ আবিষ্কৃত হলে, বিজ্ঞানীরা এতে জীবনের জৈবিক স্বাক্ষর অনুসন্ধান করেন। গ্রহের দৃশ্যমান অথবা ইনফ্রারেড বর্ণালী সালোকসংশ্লেষ বা অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন দ্বারা উৎপাদিত দুটি গ্যাস অক্সিজেন বা মিথেনের উপস্থিতি প্রকাশ করতে পারে। তারা জীবনের জন্য অপরিহার্য তরল জলের প্রমাণ অনুসন্ধান করতে পারেন। ওজোন জৈব সালফার বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের যৌগের পাশাপাশি আরেকটি জৈবিক স্বাক্ষর প্রদান করে। কিন্তু এই গ্যাস এবং যৌগগুলির কিছু অজৈব প্রক্রিয়া দ্বারাও উৎপাদিত হতে পারে; আবার এমনও সম্ভাবনা থাকে যে যখন কোনও প্রাণের প্রমান পাওয়া গেলো না, অথচ সেই গ্রহের পৃষ্ঠের নীচে—জলের সমুদ্রের মধ্যে বা মিথেন বা অ্যামোনিয়ার মতো জৈব যৌগের মধ্যে জীবনের প্রবাহ বর্তমান।

বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের অভ্যন্তরে নয়টি বস্তু শনাক্ত করেছেন যেখানে জলের ভূগর্ভস্থ সমুদ্র বা মিথেন বা অ্যামোনিয়ার মতো অন্যান্য জৈব তরল পদার্থে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। এগুলি হলো, মঙ্গল, বৃহত্তম গ্রহাণু সেরেস, বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহ ইউরোপা, গ্যানিমেড এবং ক্যালিস্টো, শনির উপগ্রহ এনসেলাডাস এবং টাইটান, নেপচুনের বৃহত্তম উপগ্রহ ট্রাইটন, এবং প্লুটো। মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে একসময় মুক্ত প্রবাহমান জল ছিল—এর কিছু অংশ এখনও ভূগর্ভস্থ অবস্থায় প্রবাহিত হতে পারে। ইউরোপার একটি ফাটলযুক্ত পৃষ্ঠ রয়েছে যা বিশাল বরফের চাদরে ঢাকা যা ভূগর্ভস্থ তরল জলের মহাসাগরগুলিকে আবৃত করে। বৃহস্পতির অন্যান্য উপগ্রহের জোয়ার-ভাটার শক্তি দ্বারা উৎপন্ন অভ্যন্তরীণ তাপের কারণে

পৃথিবীর মতো এর সমুদ্রতলেও হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট থাকতে পারে। এনসেলাডাসে ভূগর্ভস্থ জল রয়েছে এবং টাইটানে মিথেন এবং ইথেনের বিশাল মহাসাগর এবং হ্রদ রয়েছে। এই মুহূর্তে, প্লুটো গ্রহের উপর নাসার নিউ হরাইজনস মহাকাশযান নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছে। তারা প্লুটোর উত্তরের বরফের পাহাড়ি অঞ্চলে বিশাল হিমায়িত, গর্তবিহীন, তরুণ সমভূমি আবিষ্কার করেছে, যার নামকরণ করা হয়েছে "টম্বো অঞ্চল"। 1930 সালে গ্রহটি আবিষ্কারকারী ক্লাইড টম্বোর নামে এই নামকরণ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যে গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল বা থাকতে পারে।

এটা বোঝা যায় যে, বহির্জাগতিক জীবন সনাক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে ভালো সম্ভাবনা থাকবে একটি ভিনগ্রহী সভ্যতা থেকে যা বুদ্ধিমান—অন্তত আমাদের মতোই বুদ্ধিমান—এবং যোগাযোগমূলকও। 1961 সালে একজন তরুণ রেডিও জ্যোতির্বিদ ফ্রাঙ্ক ড্রেক একটি সমীকরণ তৈরি করেছিলেন যা তখন থেকে ড্রেক সমীকরণ নামে পরিচিত এবং পৃথিবী থেকে সনাক্ত করা যেতে পারে এমন ভিনগ্রহী সভ্যতার সংখ্যা এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে। ড্রেক সমীকরণটি হলো—

$$\mathbf{N = R^* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L}$$

যেখানে

N = মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে থাকা সভ্যতার সংখ্যা যার তড়িৎ চৌম্বকীয় নির্গমন শনাক্তযোগ্য;

R^* = বুদ্ধিমান জীবনের বিকাশের জন্য উপযুক্ত নক্ষত্রের গঠনের হার;

f_p = গ্রহ সিস্টেমযুক্ত নক্ষত্রের ভগ্নাংশ;

n_e = সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা, যেখানে জীবনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে;

f_l = উপযুক্ত গ্রহের ভগ্নাংশ যেখানে প্রকৃত জীবন দেখা গেছে;

f_i = জীবন ধারণকারী গ্রহের ভগ্নাংশ যেখানে বুদ্ধিমান জীবনের উদ্ভব হয়;

f_c = সভ্যতার ভগ্নাংশ যা এমন একটি প্রযুক্তি তৈরি করে যা মহাকাশে তাদের অস্তিত্বের সনাক্তযোগ্য লক্ষণ প্রকাশ করে; এবং অবশেষে

L = এই ধরনের সভ্যতার জীবনকাল।

জীবনের জন্য উপযুক্ত নক্ষত্রের গঠনের হার ছাড়া, অন্যান্য সমস্ত কারণ এখনও অত্যন্ত অনুমানমূলক। তবুও, 1961 সালে ড্রেক আমাদের ছায়াপথে প্রায় 10000টি যোগাযোগমূলক সভ্যতার অনুমান করেছিলেন। ড্রেক সমীকরণ হল একটি সহজ, আকর্ষণীয় সমীকরণ যা ইঙ্গিত দেয় যে, প্রাকৃতিক, মহাজাগতিক বিবর্তনের চূড়ান্ত ফসল হিসেবে জীবন অনন্য নাও হতে পারে এবং আমরা এই মহাবিশ্বে কোনও বিশেষ অবস্থান দখল করতে পারি না, যদিও এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীতেই প্রাণের বিকাশ লক্ষ করা গেছে।

দ্য সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স (SETI) হল বুদ্ধিমান অন্তর্জাগতিক প্রাণের সন্ধানের জন্য সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নাম। 1957 সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে লোভেল রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনের মাধ্যমে এই অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, যাতে বুদ্ধিমান সভ্যতা থেকে রেডিও সংকেত সনাক্ত করা যায়। SETI ইনস্টিটিউটটি 1984 সালে "মহাবিশ্বে প্রাণের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং প্রসার অন্বেষণ, বোঝা এবং ব্যাখ্যা করার" জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আজ এটি বিশ্বজুড়ে রেডিও টেলিস্কোপের বৃহত্তম বিতরণকারী বিন্যাস। ক্রমবর্ধমান উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও-টেলিস্কোপ স্থাপনের সাথে সাথে, অনুসন্ধানগুলি অনেক বিস্তৃত এবং গভীরতর হয়েছে, কিন্তু আমরা অন্য কোথাও কোনও বুদ্ধিমান প্রাণ সনাক্ত করতে সফল হইনি। এটি একটি বিরাট রহস্য।

সর্বোপরি, আমাদের পৃথিবী মাত্র 460 কোটি বছর বয়সী একটি গ্রহ যা মহাবিশ্বের খুব ছোট একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে; আমাদের ছায়াপথেই এমন নক্ষত্র রয়েছে যাদের বয়স দ্বিগুণ। যদি জীবন একটি এলোমেলো ঘটনা হত, তাহলে পৃথিবীতে আসার অনেক আগেই এটি গ্যালাক্সিতে উদ্ভূত হয়ে যেত। এতক্ষণে, সেই সভ্যতাগুলি মহাকাশ ভ্রমণ বা এমনকি সময় ভ্রমণের প্রযুক্তি আয়ত্ত করে ফেলত, এমনকি সম্ভবত অতি-আলোকীয় গতিতে ভ্রমণ করতেও পারত। তাদের এতক্ষণে ছায়াপথে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত ছিল। এই ধরনের উপনিবেশ স্থাপন তাদের বেঁচে থাকার জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়াত, কারণ শক্তি সমস্ত সভ্যতার চালিকাশক্তি এবং তারা তাদের গ্রহ বা এমনকি নক্ষত্রীয় শক্তির সরবরাহ অনেক আগেই শেষ করে ফেলত এবং তাই অন্য কোথাও এটি খুঁজতে বাধ্য হত। তাহলে কেন আমরা এখনও পর্যন্ত তাদের খুঁজে পাইনি? কেন তারা আমাদের আবিষ্কার করেনি? কেন তারা মহাকাশে আমাদের পাঠানো বেশ কয়েকটি রেডিও বার্তা আটকে তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়নি? এটিই হল এনরিকো ফার্মির 1950 সালে জিজ্ঞাসা করা মৌলিক প্রশ্ন, যা ফার্মি প্যারাডক্স নামে পরিচিত।

হয়তো, এই বিশাল মহাবিশ্বে আমরা সত্যিই একা, যা আমাদেরকে একটি বিরল বস্তু এবং আমাদের পৃথিবীকে একটি 'বিরল পৃথিবী' করে তোলে যা এই মহাবিশ্বের একমাত্র প্রাণকে আশ্রয় দেয়, সেক্ষেত্রে ড্রেকের সমীকরণের অন্তত একটি উপাদানকে অদৃশ্যভাবে ছোট হতে হবে। অথবা হতে পারে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শক্তির সমস্যা সমাধান করে তাদের ছায়াপথে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মহাবিশ্বের বিশালতা এবং সময়ের গভীরতা যার মধ্য দিয়ে এটি বিকশিত হয়েছে তা বিবেচনা করে এই উত্তরগুলি বেশ অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আরেকটি সম্ভাবনা হল তারা ইতিমধ্যেই একটি আর্মাগেডন-ধরণের পারমাণবিক যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলেছে; বাস্তবে, আমরা পৃথিবীতে গত শতাব্দীতে এর খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম।

অবশ্যই আরেকটি সম্ভাবনা আছে—হয়তো তারা সত্যিই আমাদের খুঁজে পেয়েছে এবং কেবল আমাদের উপর নজর রাখছে মহাকাশ থেকে, যোগাযোগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে। যে সভ্যতা—যেখানে ছায়াপথগুলি অন্বেষণ করার প্রযুক্তিগত দক্ষতা আছে—তারা অবশ্যই একটি অত্যন্ত পরিণত সভ্যতা হবে, এবং-অবশ্যই ইতিমধ্যেই ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা, এমনকি শারীরিক মৃত্যুকেও জয় করেছে। তাদের মানুষের মধ্যে সংঘাত-এবং যুদ্ধ অবশ্যই প্রাচীনকালের একটি বিষয় ছিল, যেমন ঘৃণা এবং ঈর্ষা, গোঁড়ামি এবং সামাজিক বিভেদ ছিল, আমরা এখনো এই মন্দগুলিকে জয় করা থেকে এখনও অনেক দূরে। এই পৃথিবীতে আমাদের পথ, যেখানে আমরা ক্রমাগত লড়াই করি, রক্তপাত করি, হত্যা করি এবং অকথ্য নৃশংসতা চালাই—আমাদের সহ-মানুষদের উপর—একটি উন্নত, বুদ্ধিমান এবং পরিশীলিত আন্তঃগ্যালাক্টিক সভ্যতার কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে হবে। আমাদের কাছ থেকে লুকানোর জন্য আমরা তাদের দোষ দিতে পারি না, বরং আমাদেরই নিজেদের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র

1. Lemonick, Michael D.,"Is Anybody Out There", *National Geographic,* July 2014;
2. Caltling, David C., *Astrobiology, A Very Short Introduction,* OUP, New York, 2013;
3. Asimov, Isaac, *Asimov's Guide to Science,* Penguin Books, 1987;
4. Cockell, Charles, *Astrobiology and the Search for Extraterrestrial Life,* University of Edinburgh, Coursera, 2015;
5. Bhattacharjee, Govind, *Story of the Universe,* Vigyan Prasar, 2017.

লেখক ***ডঃ গোবিন্দ ভট্টাচার্য*** *একজন বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞান লেখক, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, শিক্ষাবিদ, এবং বর্তমানে অরুণ জেটলি ইনস্টিটিউট অফ ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক। ইমেল: govind100@hotmail.com.*

আনবিক জীব বিজ্ঞানী ম্যাক্সিন এফ সিঙ্গার

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

ম্যাক্সিন এফ সিঙ্গার বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী গত 2024 সালের 9ই জুলাই, মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় 93 বছর বয়সে মারা যান। তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে তাঁর বাড়ীতে দীর্ঘদিন ফুসফুস জনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। উনি ওয়াশিংটনের একটি গবেষণা সংস্থা কার্নেগি সায়েন্স গবেষণা সংস্থায় 14 বছর সভাপতি ছিলেন। উনি ছিলেন জীবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজির এক প্রথম সারির আনবিক জীব বিজ্ঞানী। ডঃ সিঙ্গার একজন জৈব রসায়নবিদ, ফেডারেল স্বাস্থ কর্মকর্তা। তিনি গত সত্তরের দশকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক নুতন নির্দেশিকা তৈরি করেছিলেন ও পরীক্ষাগারে তৈরি জীবাণুর বিস্তারের ক্ষেত্রে মানুষকে অমুলক ভয় বা আশংকা থেকে বিরত করেছিলেন। তাঁর গবেষণা জৈবপ্রযুক্তির নতুন

ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত করেছিল ও বিজ্ঞানের এক নূতন পথ বা দিগন্ত খুলে দেয়। দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে তার কর্মজীবনে ম্যাক্সিন সিঙ্গার আণবিক জীব বিজ্ঞানী ও একজন দক্ষ বিজ্ঞান প্রশাসক হিসাবে নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। তবে তাঁর জয়যাত্রার পথ তত সহজ বা মসৃন ছিল না। এই প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে।

ম্যাক্সিন ফ্রাঙ্ক সিঙ্গার নিউ ইয়র্ক সিটিতে 1931 সালের 15ই ফেব্রয়ারি জন্মগ্রহন করেন। তাঁর মা ছিলেন হেনরিয়াটা, উনি সংসারে সবার দেখাশোনা করতেন। বাবা হাইম্যান ফ্রাঙ্কে ছিলেন একজন আইনজীবী। ম্যাক্সিন ছোটবেলায় ব্রকলিনের মিডউড পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করেন। মিডউড পাবলিক স্কুলের এক রসায়নের এক শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। পরে তিনি সোর্থমোর কলেজে ভর্তি হন । ডঃ সিঙ্গার 1952 সালে অন্য আর চার জন ছাত্রীর সাথে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি রসায়নে মেজর হন ও পাঁচজন মহিলা ছাত্রীর সাথে খুব বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। একজন বাদে তারা সকলেই জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ লাভ করেন। পঞ্চম বন্ধু চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চলে যান। তিনি একসময়ে বলেন তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের তুলনায় এই ছয় ছাত্রীরাই পড়াশোনায় ভাল ছিল।

স্নাতক হওয়ার পরপরেই তিনি ড্যানিয়েল সিঙ্গারকে বিয়ে করেন। উনি ছিলেন একজন রাষ্টবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক। ড্যানিয়েল সিঙ্গার তাদের চার সন্তান অ্যামি, ডেভিড, এলেন, স্টেফানি এবং তাদের নাতি-নাতনিদের নিয়ে ম্যাক্সিন এফ সিঙ্গারের মৃত্যুর পরেও বেঁচে ছিলেন। তবে তিনিও গত 2025 সালের এপ্রিল মাসে মারা যান।

এক সময় ম্যাক্সিন হাঙ্গেরীর হারগিট্টাই নামক একজন বিশিষ্ট লেখক ও রসায়নবিদের সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন ‘আমি মনে করি একজন স্নাতক হিসাবে আমি যদি সেই দলে না থাকতাম তবে আমার বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি আগ্রহও গড়ে উঠতো না।’ সেই বছর ফাউন্ডেশনের দেওয়া 600টি প্রিডক্টোরাল ফেলোশিপের মধ্যে 32 জনই ছিলেন মহিলা।

ডঃ সিঙ্গার 1957 সালে ইয়েল থেকে জীব রসায়ন বা বায়োকেমেস্ট্রিতে ডক্টরেট পান। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল প্রোটিনের রসায়ন। পরে উনার উপদেষ্টা পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁর পোষ্টডক্টরাল কাজগুলি নতুন একটি বিষয় নিয়ে করেন। তখন DNA, RNA বংশগতির বিবর্তন এবং রোগ নির্নয়ের চাবিকাঠি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আসলে জৈব রসায়নের ভবিষ্যত লুকিয়ে আছে এই বিষয়ের উপর। মার্কিন দেশে খুব কম বিজ্ঞানীই সেই সময় নিউক্লিক অ্যাসিডের উপর গবেষণা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ.ডব্লিউ. বুশ 1991 সালে ডঃ সিঙ্গারকে ন্যাশনাল মেডেল অফ সায়েন্সে ভূষিত করেন, যা এই ক্ষেত্রে মার্কিন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান
ছবি সৌজন্য ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি আর্কাইভ, Nature briefing পত্রিকা।

সেই পরামর্শ অনুযায়ী উনি বেথেসডাতে ন্যাশানাল ইনস্টিউট অফ আর্থ্রাইটিস, মেটাবলিজম অ্যান্ড ডাইজেস্টিভ ডিজিজেসে ফেলোশিপ গ্রহন করেন। ডঃ সিঙ্গারের নিজস্ব কাজ ছিল RNA সংশ্লেষণ, DNA এবং RNA সংশ্লেষণে এনজাইমের ভূমিকা। সেখানে তিনি ডঃ লিওন হেপেলের সাথে কাজ করেন যিনি কিনা নিউক্লিক অ্যাসিড রসায়ণ নিয়ে গবেষণারত এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ডঃ সিঙ্গার ইউরোসিলের ট্রিপলেটের জন্য UUU এর মত বেস রাসয়নিকের বিভিন্ন অনুক্রমের সমন্বয়ে RNA স্ট্রন্ডের একটি লাইব্রেরী তৈরি করেন। তিনি N.I.H.-এ কর্মরত তার সহকর্মী মার্শাল ডব্লিউ নিরেনবার্গকে এই স্ট্রেন্ড শেয়ার করেন, যিনি জেনেটিক কোড ক্র্যাক করতে ওইগুলি ব্যবহার করেছিলেন। এই আবিস্কারের জন্য 1968 সালে ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নিরেনবার্গ নোবেল পুরস্কার পান। ডঃ সিঙ্গার যদিও নিরেনবার্গের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কাজে সহযোগিতা করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন কেননা তিনি তার ব্যাক্তি স্বাধীনতাকে বেশি মূল্য দিতেন।

ডঃ সিঙ্গার বেথেসডা ইনস্টিউটের জীব রসায়ন নিয়ে 17 বছর ধরে গবেষণা করেন। তিনি 1975 সালে ন্যাশানাল ক্যানসার ইনস্টিউটের নিউক্লিক অ্যাসিড বিভাগে যোগ দেন। 1980 সালে তিনি সেই সংস্থার প্রধান হিসাবে তাঁর পদন্নোতি হয়। তিনি ছিলেন কার্নেগি ইনস্টিউট অফ সায়েন্সের (এখন কার্নেগি সায়েন্সে নামে পরিচিত) অষ্টম সভাপতি। তিনি সেখানে 1988 থেকে 2002 সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। তার নেতৃত্বে সেখানে গ্লাবোল ইকোলজির একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয়। ডঃ সিঙ্গার ন্যাশানাল ইনস্টিউট অফ সায়েন্সের সদস্য ছিলেন ও মার্কিন দেশের বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ পদক জাতীয় বিজ্ঞান পদক পান। তাছাড়া তিনি 100টিরও বেশি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন এবং ডঃ বার্গের সাথে বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন।

এবার তাঁর বিতর্কিত জৈবপ্রযুক্তির গবেষণা প্রসঙ্গে আসা যাক। 1960 এর দশকে ডঃ সিঙ্গার উদ্ভাবিত জেনেটিক কোড ক্র্যাকিং নতুন আবিস্কারের পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানীদের ব্যাঙ, ফলের মাছি ও ব্যাকটেরিয়া থেকে DNA নিস্কাশনের কৌশল আবিস্কার করার পদ্ধতি দেখিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে তৈরি এমন জীব তৈরি করা হয় যা প্রকৃতিতে তা আগে ছিল না। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা "জিন স্প্লিসিং" নামে পরিচিত। এই সব আবিস্কার বিজ্ঞানী মহলে ও জনমানসে কৌতুহলের সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেকের মনে হয় পরীক্ষাগারে নতুন সৃষ্ট কিছু জীবের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিন রয়েছে এবং তা কতটা নিরাপদ সে বিষয়ে সন্দেহের বাতাবরন তৈরি হয়। বিজ্ঞানের এই নতুন ধারাকে অনেকেই ভাল ভাবে গ্রহন করেনি।

এই বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়। তাই 1973 সালে জাতীয় সায়েন্স ইনস্টিটিউডের প্রশাসক ডঃ সিঙ্গার ও তার এক সহ গবেষকের লেখা এই বিষয়ে একটি চিঠি সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়। তার আগে এই উদ্বেগ সাধারণ মানুষের বা সংবাদ মাধ্যমের জানা ছিল না।

তারপর একটি জেনেটিক্স কনফারেন্সে যোগদানকারী বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে আরেকটি চিঠি পাঠান হয়। এই চিঠিতে তারা আশংকা করেন যে জিন বিভাজন মানুষের পক্ষে কতটা কার্যকরী বা ভালো তাতে সন্দেহ রয়েই যায়। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে কিছু হাইব্রিড অণু পরীক্ষাগারের কর্মীদের ও সাধারণের জন্য বিপদজ্জনক হতে পারে। যদিও তারা বলেন এখনও এই সম্পর্কে কোন বিপদ প্রমানিত হয়নি, তবু সম্ভাব্য বিপদটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিৎ।

এই চিঠি প্রকাশের পর ফেডারেল সরকারের একটি সংস্থার উপদেষ্টা ন্যাশানাল একাডেমি অফ সায়েন্সেকে বিজ্ঞানের এই বিতর্কিত সমস্যার সমাধান করার জন্য আহ্বান জানান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরগুলিতে বিক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে

ডঃ সিঙ্গার 1988 থেকে 2002 সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের কার্নেগি ইনস্টিটিউশন ফর সায়েন্সের সভাপতি ছিলেন।
ছবি সৌজন্য কারনেগি সায়েন্সের মাধ্যমে, Nature briefing পত্রিকা

পড়েছিল, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা নতুন প্রযুক্তির নিরাপত্তার মূল্যায়নের পরীক্ষায় নিজেদেরকে গিনিপিগ হিসাবে দেখেছিলেন। এসমস্ত চাঞ্চল্যকর খবর সংবাদ মাধ্যমে বের হবার পর চারদিকে অমুলক ভয়ের অবস্থা তৈরি হয়। অনেকেই মনে মনে 1971 সালের সিনেমা 'থ্রিলার দ্যা অ্যান্ড্রোমিডা স্ট্রেন' এর সাথে মিল আছে এমন এক মহামারীর কল্পনা করেছিলেন। নিউইয়র্ক আইনসভা এই নতুন প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়েছিল। কিন্তু গভর্নর হিউ এল কেরি শিক্ষার স্বাধিকার বা স্বাধীনতা বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন বলে বিলটিতে ভেটো দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানীদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় এ্যাকাডেমি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের একটি ছোট কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটিতে ডিএনএর ডাবল হেলিক্স গঠনের আবিস্কারক জেমস ডি ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস এইচ সি ক্রীকও ছিলেন। সেই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন স্ট্যানফোর্ডের আনবিক জীব বিজ্ঞানী পল বার্গ যিনি জিন বিভাজনে তার আবিস্কারের জন্য রসায়নে 1980 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবু জেনেটিক কোড সমাধানে তার অবদান, রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ কৌশল নিয়ে নৈতিক ও নিয়ন্ত্রক বিতর্কে তার ভূমিকা ছিল অসামান্য।

ফেডারেলের নির্দেশিকা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী স্ট্রেন বা ক্যানসার সৃষ্টিকারী ভাইরাস সহ সমস্ত জিন বিচ্ছেদ পরীক্ষার উপর একটি স্থগিতাদেশ জারী করা হয়। কমিটিও তাতে সম্মতি দেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ধরনের পদক্ষেপ ছিল প্রথম। ডঃ ফ্রেডারিকসনের এক বিবরনী অনুযায়ী জানা যায় যে একটা পর্যায়ে ডঃ ওয়াটসন আকস্মিক ভাবে স্থগিতাদেশ উপর তুলে নেবার আহ্বান জানান। তখন ম্যাক্সিন সিঙ্গার কমিটির কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে গত ছয়মাসে এমন কি পরিবর্তন ঘটল যাতে ডঃ ওয়াটসন স্থগিতাদেশ আনলেন?

বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক মহলের কাছ থেকে সমর্থন চেয়ে 1973 সালের জানুয়ারী মাসে ডঃ সিঙ্গারের নেতৃত্বে একটি

ম্যাক্সিন ফ্র্যাঙ্ক সিঙ্গার সিঙ্গার হলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। এটি আমেরিকান কলেজ ক্যাম্পাসে কোনো নারীর নামে নামকরণ করা হাতেগোনা কয়েকটি বিজ্ঞান ভবনের মধ্যে অন্যতম।

কনফারেন্স ক্যালিফোর্নিয়ার কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কনফারেন্সটি রিকম্বিন্যান্ট DNA অ্যাসিলোমার হিসাবে পরিচিত। এই সভায় 12টি দেশের 150 জন বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। পরে সেই মুহূর্তটির কথা স্মরণ করে ডঃ সিঙ্গার বলেছিলেন "আমাদের অনুপ্রেরণা ছিল বিপদের ন্যূনতম অবস্থায় গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

পরের বছরের বেশির ভাগ সময় ডঃ সিঙ্গার N.I.H.-এর সাথে কাজ করেন। 1976 এর মাঝামাঝি সময়ে জারি করা নির্দেশিকা পরীক্ষার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নতুন গবাষণার জৈবিক নিয়ন্ত্রনের ক্রমবর্ধমান স্তর নির্ধারন করেন। পরীক্ষাগারে উচ্চ ঝুঁকির পরীক্ষাগুলির জন্য পৃথক বায়ু চলাচল ও জলের ব্যাবস্থা সহ 'হট জোন' ধরনের আলাদা ঘরে পরিচালনা করা হয়েছিল। তখন গবেষকেরা পরীক্ষাগুলি শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন ও মারাত্মক জীবাণু পরীক্ষা নিষেধ ছিল।

কিন্তু নির্দেশিকা বিতর্ক তাকে পিছু ছাড়েনি। তিনি কেমব্রিজ পৌরসভার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাবলিক ফোরামে ম্যাস নামক একজন অধ্যাপকের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে কংগ্রেসের সামনে হাজির হন। সেই কংগ্রেসে 1976 থেকে 1978 সাল পর্যন্ত জিন বিভাজন নিয়ন্ত্রনকারী এক ডজনেরও বেশি বিলের প্রস্তাব করেছিল। তবু ডঃ সিঙ্গার সব বাধা অতিক্রম করে একজন শক্তিশালী গবেষক হয়ে উঠেছিলেন। N.I.H.-এর বিজ্ঞানীরা নতুন প্রযুক্তি বুঝতে পেরে নিষেধাজ্ঞাগুলি ক্রমে শিথিল করেছিলেন। আজ জিন বিভক্তকরন পরীক্ষায় পরীক্ষাগারে গবেষণার যন্ত্রপাতি, জৈব প্রযুক্তি ওষুধ এবং রোগ প্রতিরোধী ফসল নিয়মিত ব্যাবহার করা হয়।

এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে 1991 সালে ডঃ ডোনাল্ড এইচ ফ্রেডারিকসন যিনি তখন NIH-এর পরিচালক ছিলেন তিনি "জিন স্প্লিসিং" বা জিন বিভাজন বিতর্কের উপর একটি বিবরণ লিখেছিলেন। সেখানে উনি বলেছিলেন পাঁচ বছরের

1989 সালে বায়োকেমিস্ট ম্যাক্সিন এফ. সিঙ্গার। সত্তরের দশকে, তিনি জিন স্প্লিসিং নামে একটি নতুন প্রক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি এবং বিপদ উভয়ই দেখেছিলেন
ছবি সৌজন্য ব্রুস রেডি, কার্নেগি সায়েন্সের মাধ্যমে, Nature briefing পত্রিকা

তীব্র বিতর্কের পর নতুন ধারা আস্থা অর্জন করবে। এটি এমন এক পরীক্ষা যা পরবর্তী দশকগুলিতে পূনারাবৃত্তি হবে কারন বিজ্ঞানীরা ভ্রূণের স্টেম সেল, জীবের ক্লোন এবং জিন সম্পাদনা করতে শিখেছেন।

ডঃ সিঙ্গারের জন্য জিন বিভক্তি বা "জিন স্প্লিসিং" বিতর্ক ছিল নতুন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার একটি পাঠ, তাই তিনি এগিয়ে গেছেন। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সেসব আবিস্কার ছিল অপরিহার্য অথচ যা কিনা মোটেই ভয়ের কোন বিষয় ছিল না। তিনি 2002 সালে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন "আমি বিভিন্ন মঞ্চে এই নিয়ে আলোচনা করেছি যা বলাটা আমার জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হ্যাঁ, আমি একজন বোকা ছিলাম, তবে পাগল ছিলাম না। তবে তার জন্য আমি গর্বিত।"

বিজ্ঞানে মহিলাদের পক্ষে তিনি ছিলেন একজন প্রবক্তা। তিনি মহিলাদের পরিবারের ও কাজের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নীতি পরিবর্তনের জন্য আহ্বান করেছিলেন। 1988 সালে একটি টেলিভিশনের সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন "আমি জীব বিজ্ঞানের জন্য একটি অসাধারণ সময় কাটিয়েছি এবং এমন কোন দিন নেই যখন আমি অন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম"।

তথ্য সূত্র

১। নিউ ইউর্য়ক টাইমস। ডেনিস গেলিন দ্বারা লিখিত, 10 জুলাই, 2024
২। Nature briefing পত্রিকা 16 জুলাই, 2024
৩। http//www.science history.org
৪। http//www.profile.nim.nin.gov

*লেখক **শ্রী বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী** একজন বিজ্ঞান লেখক এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ একাডেমি–কলকাতা ও ওয়েষ্ট বেঙ্গল বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটির সদ্যস।*
ইমেল : goswamibiswaranjan@gmail.com

‘নিপাহ্’ ছড়াতে ফলাহারী বাদুড় কতটা দায়ী?

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

‘নিপাহ্’ ভাইরাসের সঙ্গে ফলাহারী বাদুড়-এর একটা যোগ আছে। সেটা সত্যি হলেও ফলের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমণের তত্ত্ব আজ অবধি কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। আবার নিপাহ্ ভাইরাস সংক্রমণের রূপরেখা কোনটি, এই প্রশ্নে কিছুটা হতবুদ্ধি ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই রয়েছেন বিশ্বের আপামর বিজ্ঞানীমহল। এর কারণ হল—1998-এর সেপ্টেম্বরে প্রথমবার মালেশিয়ায় সংক্রমণের ঘটনা নজরে আসবার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে কয়বার সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, তাতে প্রতিবারই কোনও বিশেষ ‘একটি’ কারণ দেখা যায়নি। প্রথম ঘটনায় শুকরের সংক্রমণ যেমন নজরে এসেছে, পরবর্তীতে ভাইরাস সংক্রামিত খেজুরের রস ও বাদুড়ের উপস্থিতি দেখা গেছে বাংলাদেশ (2001 সালে) ও নদীয়া (2007 সালে)-র ঘটনায়, আবার শিলিগুড়ির ঘটনায় (2001 সালে) এগুলো কিছুই তেমনভাবে নজরে আসেনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মানুষের মধ্যে রোগের সংক্রমণ দেখা গেছে এবং মানুষ থেকে মানুষে তা ছাড়িয়েছে।

কেরালার ঘটনায় বাদুড়ের সংযোগ (উপস্থিতি) আপাতভাবে নজরে এলেও, সেই সমস্ত বাদুড়ের দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি বা নিপাহ্ ভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরী হওয়া অ্যান্টিবডির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ফলে রোগ ছড়ানোর নির্দিষ্ট কোনও কারণকে চিহ্নিত করা যায় নি।

এবারের নার্সদের দেহে নিপাহ্ ভাইরাসের সংক্রমণ ঠিক কী ভাবে হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে উৎস হিসাবে খেজুর রস এবং বাদুড়ের ভূমিকাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করছেন অনেকেই।

নিপাহ্ ভাইরাসজনিত রোগটির প্রকৃতি আলোচনা করলে বিষয়টা বোধ করি একটু পরিষ্কার হবে। নিপাহ্ (Nipah) ভাইরাস সম্পর্কে প্রথম জানা যায় মালোশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ‘নেগেরি সেমবিলান’ জেলার ‘ক্যামপাঙ্গ সাঙ্গাই নিপাহ্’ নামক গ্রামে শূকর খামারীদের অজানা জ্বরে মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের সুবাদে। তখন শূকর ও মানুষের (খামারীদের) দেহে এক নতুন ধরনের ভাইরাস পাওয়া যায়, যা ‘হেন্ড্রা’ নামক ‘প্যারামিক্সো’ জাতীয় একধরনের আর এন এ ভাইরাসের দোসর। 1994 সালে এই হেন্ড্রাভাইরাস মিলেছিল অস্ট্রেলিয়ার ‘ব্রিসবেন’ শহরের অদূরে ‘হেন্ড্রা’ নামক জায়গায়। একসাথে ঘোড়া ও মানুষের শরীরে। নতুন ভাইরাসটি ও হেন্ড্রা ভাইরাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানালেন, মালেশিয়ায় খোঁজ পাওয়া নতুন ভাইরাসটি পুরোপুরি হেন্ড্রা ভাইরাসের মত নয়। এটি একটি নতুন প্রজাতির ভাইরাস। নাম দেওয়া হল—‘নিপাহ্’ (গ্রামটির নাম থেকে) । আর ভাইরাসের জেনাস করা হল—হেনিপাহ্ (হেন্ড্রা ও নিপাহ্-র সমন্বয়ে)।

নিপাহ্ ভীষণ মারাত্মক ও মানুষের ছোঁয়াচে রোগ সৃষ্টিকারী একটি ভাইরাস। মস্তিষ্কের প্রদাহ (এনকেফেলাইটিস) তৈরী করে বলে মাথা যন্ত্রণা, ঝিমুনী, জ্বরে ভুল বকা, স্মৃতিলোপ পাওয়া, পরের দিকে খিঁচুনী ও মৃত্যুর আগে কোমায় চলে যাওয়া এই সংক্রমণের রোগ-লক্ষণ। লালারস, ঘাম, মূত্র ও অন্যান্য দেহ-নিঃসৃত জলীয় পদার্থের মাধ্যমে এই ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর থেকে বেরিয়ে আসায় তার সংস্পর্শে থাকা মানুষেরা সহজেই আক্রান্ত হন। এইভাবে দ্রুত রোগ ছড়ায় বলে রোগের মড়ক তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছোঁয়াচে ও ভীষণ ক্ষতিকর (প্রাণঘাতী) বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘বায়ো-সেফটি লেভেল ফোর’ রোগজীবাণুর তালিকায় এই ভাইরাসকে রেখেছে। এই তালিকায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইবোলা, সার্স, জিকা প্রভৃতি উঠতি ত্রাস সৃষ্টিকারী ভাইরাসরা রয়েছে।

এখন পর্যন্ত জানা তথ্য অনুযায়ী, নিপাহ্ ভাইরাস মানুষের রোগবিস্তার করে তার মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনে; অথচ বাদুড়সহ বেশ কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে। এমনকি, এদের দেহে কোনও রোগলক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। গরু, ঘোড়া, কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে এই অদ্ভুত বিশেষত্ব চোখে পড়েছে। ফলাহারী বাদুড়ের বেশ কয়েকটি প্রজাতি নিপাহ্ ভাইরাসের স্বাভাবিক পোষক (ন্যাচারাল হোস্ট)। এদের মধ্যে একটি অদ্ভুত পারস্পরিক সখ্যতা লক্ষ করা গেছে। বাদুড় তার অধিক রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতার বলে একদিকে যেমন নিপাহ্ ভাইরাসকে

ঠেকিয়ে রাখে, রোগ সৃষ্টি করতে দেয় না; তেমনি এই ভাইরাসও বাদুড়ের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাকে (ইমিউন সিস্টেমকে) পাশ কাটিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বাদুড়ের দেহে বজায় রাখে ও বংশ বিস্তার করে। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে দুপক্ষের স্বার্থ চরিতার্থ হয়। কিন্তু সবকিছু গোল বাধে বাদুড়ের স্বাভাবিক জীবনে ছন্দ-পতন ঘটলে। বাদুড় খাদ্য ও বাসস্থানের স্বল্পতাজনিত কারণে চাপে (স্ট্রেস) থাকলে তার রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা কমে যায়, ফলে তার দেহে ভাইরাসের সংখ্যা বেড়ে যায়। সংখ্যাবৃদ্ধি হয় বলে ভাইরাস বাদুড়ের দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ে অন্য পোষকের খোঁজে। একে পরিভাষায় বলে 'স্পীল ওভার' (উপচে পড়া)। এই স্পীল ওভারই যাবতীয় সমস্যার মূলে। বাদুড়ের লালারস, ঘাম ও মূত্রের মধ্যে দিয়ে দেহের বাইরে বেড়িয়ে আসে। এই সময় অন্তবর্তী পোষোক (ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট) এবং মানুষের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। শূকর হলো ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। বাদুড়ের মুখ দেওয়া খেজুর ও তালের রস বা ফল তখন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম হতে পারে।

উপযুক্ত ওষুধ ও টীকা এখনও না তৈরি হওয়ায় নিপাহ্ ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ রয়েছে। তবে উপায়? ভাইরাস-সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন জন-স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা। যথাসম্ভব ভাইরাসের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের। ন্যূনতম কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই তা সম্ভব। গৃহপালিত পশুর পরিচর্যার পর ভাল করে সাবান জলে হাত ধুয়া নিতে হবে। খেজুর ও তালের রস সরাসরি না খেয়ে অন্তত আধঘন্টা রৌদ্রে রেখে অথবা ফুটিয়ে তার পরে খেতে হবে। যে কোনও জিনিস খাবার আগে হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। সেটা সাবান জলে হলেই ভাল। জলে না ধুয়ে ফল খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। মাটিতে পড়ে থাকা ফল বা 'কিছুটা খাওয়া' ফল পরিহার করা উচিত।

বাজার থেকে কেনা ফল বা গাছের টাটকা ফলকে ধুয়ে খেতে হবে। খুব ভাল হয়, ফলগুলোকে 3–5 মিনিট নুন জলে (1 লিটার জলে আধ চামচ নুন) ডুবিয়ে, পরে সাধারণ জলে ভাল করে ধুয়ে নিলে। তাতে নোনতা-স্বাদ আর থাকবে না। জীবাণু ও ভাইরাস নোনা জলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। ●

লেখক ***ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার*** *পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ও প্রচারক। ইমেল: joardar69@gmail.com*

বক্সার জঙ্গলে কালিজ ফিজ্যান্টের দেখা

অমর কুমার নায়ক

নভেম্বর মাসে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প গিয়েছিলাম পাখি আর পোকামাকড়ের খোঁজে। ভোর রাতে ট্রেন থেকে নেমে বক্সার জিরো পয়েন্ট অবধি গাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল আমাদের। পথে যেতে যেতে চারপাশে চোখ রাখছিলাম। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে বন্য প্রাণীদের জেগে ওঠা শুরু হয়ে যায়। পথে যেতে যেতে আমাদের চোখে পড়েছিল নানান পাখি আর প্রজাপতি। একটা তিলাজ বাজ পাখি পথের ধারে বসে ছিল হয়ত শিকারের সন্ধানে। আমাদের গাড়ী থেকে নামার সাথে সাথে সে গাছের ডালে উড়ে গিয়ে বসল। এভাবে যেতে যেতে সাঁতালাবাড়ী অবধি পৌঁছে গেলাম। সেখানে হালকা ব্রেকফাস্ট করে ওখান থেকে গাড়ী আর গাইড দুইই সঙ্গে নেওয়া হল। জিরো থেকে হেঁটে যেতে হবে বক্সা ফোর্ট। এই পথে গাইডের সাথে হাঁটতে শুরু করলাম। জিরো থেকেই পাখি আর প্রজাপতির ওড়াউড়ি বেড়ে গেল। এসব দেখতে দেখতে দু'পা চলছি থামছি আর ছবি তুলছি। এমন করেই আমরা একটা ভিউ পয়েন্টে এসে পৌঁছালাম। এখানে এসে যখন উপরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি তখন তমোঘ্ন আর অনিরুদ্ধ দুজনে প্রথম দেখল একটু উপরে কালিজ ফিজ্যান্টের জোড়া খাবারের সন্ধানে ঘুরছে। আমি যখন উপরে উঠে এলাম তখন স্ত্রী পাখিটিকে দেখলাম নীচে নেমে যেতে আর পুরুষ পাখিটি গাছের আড়ালে চলে গেছে। তাই বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করতে থাকলাম ছবি তোলার আশায়। ছবি তুললাম যতক্ষণ না নীচে নেমে গেল। এরা ভীষণ সতর্ক প্রকৃতির হয়। সামান্যতম বিপদের আশঙ্কা করলে

কালিজ ফিজ্যান্ট পুরুষ
(ছবি - তমোঘ্ন সেনগুপ্ত)

কালিজ ফিজ্যান্ট স্ত্রী ও পুরুষ (ছবি - তমোঘ্ন সেনগুপ্ত)

তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে পড়ে। বক্সায় ঢুকেই কালিজ ফিজ্যান্টের মতো পাখির দেখা পেয়ে সবার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এতটা পথ ট্রেক করতে হবে ভেবে এতক্ষণ ভাবনায় ছিলাম এখন ভাবছি এই পথে হেঁটে কী কী পেতে পারি আমরা। এই ছিল পাখিটি প্রথম দেখা। বক্সা পৌঁছে ঐ দিন দুপুরে খাবার খাওয়ার পর আমাদের হোমস্টের মালিক ও বক্সায় আমাদের লোকাল গাইড প্রকাশ থাপা দাদার সাথে বেড়িয়েছিলাম বক্সা সদর বাজারের পেছনের জঙ্গল ও পাহাড়ি পথে ঘুরতে এবং পাখি ও পোকামাকড়ের সন্ধান করতে। আলো আঁধারে ভরা এক জায়গায় নিস্তব্ধ জঙ্গলে কালিজ ফিজ্যান্ট পুরুষের ডাকে বেশ চমকে উঠেছিলাম। বেশ সুন্দর দেখতে এই পাখিটি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক কয়েকটি কথার মধ্যে দিয়ে।

Kalij Pheasant পাখিটি Phasianidae পরিবারের অন্তর্গত পাখি। এদের বিজ্ঞান সম্মত নাম *Lophura leucomelanos*। মূলত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জঙ্গল এবং ঘন ঝোপঝাড়ে এদের দেখা পাওয়া যায়। জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্য পাখি এই কালিজ ফিজ্যান্ট। এদের বাংলা নাম কালিজ, কালিজ তিতির, কালো মথুরা বা কালো ময়ূর। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মায়নমার ও থাইল্যান্ডে এদের দেখা পাওয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পাখির মুখে চোখের চারপাশে লাল রঙের চামড়ার আস্তরন থাকে। পুরুষের গায়ের উপরের অংশের রং চকচকে নীলচে কালো এবং স্ত্রীদের ফ্যাকাসে বাদামি থেকে লালচে বাদামি। স্ত্রীদের গায়ে ধূসর রঙের ধার থাকে পালকের প্রান্তে যার জন্য এদের শরীর আঁশে ঢাকা মনে হয়। পুরুষদের দেহের তলদেশ ও কোমরের উপরের দিক সাদা হয়। পুরুষদের লেজ চকচকে নীল রঙের। এদের মাথায় টিকির মতো পালক দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের চোখের রং তামাটে বা হলদে বা কমলা-বাদামি হয়। পুরুষ পাখিটি 65 সে.মি. এবং স্ত্রী পাখিটি 60 সে.মি. দৈর্ঘ্যের হয়। এরা সাধারণত জোড়ায় বা ছোট দলে থাকে। এরা মাটি থেকে খাবার খুঁটে খায়। ভয় পেলে খুব জোরে দৌড়ায়। ভালো উড়তেও পারে। রাত্রে গাছের ডালে বিশ্রাম নেয়। ভোর এবং গোধূলির সময় এদের সক্রিয়তা বাড়ে। কালিজের খাদ্য তালিকায় আছে বিভিন্ন ফল, বীজ, গাছের শিকড়, ছোট পোকামাকড়, ছোট সাপ এবং গিরগিটি। এদের প্রজনন কাল মার্চ থেকে অক্টোবর। এই সময় স্ত্রী পাখিটি মাটির কিছুটা অংশ খুঁড়ে পাথর, লতাপাতা ও ঘাস দিয়ে বাসা বানায়। স্ত্রী পাখিটি 6–9টি ডিম পাড়ে। এই প্রজাতিটি আই.ইউ. সি.এন. লাল তালিকা অনুযায়ী 'লিস্ট কনসার্ন' শ্রেণিভুক্ত। তবে জঙ্গল হ্রাস পাওয়ায় এবং বনাঞ্চলের মধ্যে মানুষের সক্রিয়তা বাড়ার কারণে এরা সমস্যায় পড়েছে। আগে এদের প্রচুর শিকার করা হত, এমনকি 'গেম বার্ড অফ ইন্ডিয়া' বইয়েতেও এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ●

*লেখক **শ্রী অমর কুমার নায়ক** একজন শিক্ষক এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেল: amarnayak.stat@gmail.com*

লজ্জাবনত লজ্জাবতী

অরুণিমা ভৌমিক

পৃথিবীর বুকে রোজই কত না অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এমনই এক অতি পরিচিত ঘটনা হল, লজ্জাবতী গাছে স্পর্শ করার সাথে সাথেই পাতা মুদে যায় এবং গাছটি নুইয়ে পড়ে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি কবিতায় যথার্থই বলেছেন:

"ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতীলতা।
একান্ত সঙ্কোচ করে, এক ধারে আছে সরে,
ছুঁইও না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।"

ছেলেবেলা থেকে আমরা প্রায় সকলেই কম বেশি এই ঘটনার সাক্ষী। লজ্জাবতীর এহেন বৈশিষ্ট্যের কারণে, আমাদের মননে এই আপাত তুচ্ছ ঘটনাটি চিরন্তন অনুসন্ধিৎসার বীজ বপন করে রেখেছে। কিন্তু, আমরা সেভাবে কখনই ভেবে দেখি না যে, লজ্জাবতীর লাজবন্তী হয়ে ওঠার পেছনেও রয়েছে বিজ্ঞান, যা কিনা এক অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যের চমৎকার উদাহরণ।

এবার লজ্জাবতী উদ্ভিদটির সাথে একটু পরিচিত হওয়া যাক। লজ্জাবতীর বিজ্ঞানসম্মত নাম *Mimosa pudica* এবং এটি ফ্যাবেসি পরিবারের অন্তর্গত একটি গুল্ম জাতীয় বহুবর্ষজীবী স্পর্শকাতর উদ্ভিদ। লজ্জাবতীর ল্যাটিন নামকরণের অন্তর্নিহিত অর্থও বেশ চমকপ্রদ! গণ নামের প্রথমাংশ 'Mimo' শব্দের অর্থ 'নকল করা' এবং 'osa' শব্দের অর্থ 'নারী', অর্থাৎ একটু খোলসা করে বললে 'নারী চরিত্রকে নকল করা'। অন্যদিকে, প্রজাতি নাম 'pudica' শব্দটির অর্থ 'লজ্জা' বা 'লজ্জাবতী নারী'। আর আমরা সকলেই জানি যে, লজ্জা নারীর ভূষণ, থুড়ি লজ্জাবতীর। এই উদ্ভিদটির আদি বাসভূমি সুদূর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলসমূহে হলেও প্রকৃতির বিস্তারণের নিয়মে বর্তমানে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও এটির দেখা মেলে।

মূলত ঝোপেঝাড়ে বেশি দেখতে পাওয়া গেলেও লজ্জাবতী গাছ সব রকম পরিবেশেই সহজে মানিয়ে নিতে সক্ষম। এক একটি লজ্জাবতী গাছের উচ্চতা প্রায় 30 সেমি. থেকে 1 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। লজ্জাবতীর কান্ডটি সরু এবং বাদামী বর্ণের। লজ্জাবতীর ফুল দেখতে গোল বলের মত। 2–3 সেন্টিমিটার লম্বা পুষ্পদণ্ডের মাথায় অত্যন্ত নরম এবং হালকা বেগুনি রঙের ফুল (চিত্র 1) ফোটে। প্রতিটি পত্রবৃন্তের গোড়া থেকে একটি করে পুষ্পদণ্ড বের হয়। লজ্জাবতী গাছে সারাবছরই ফুল ফোটে এবং ফল দেখা যায়। তবে জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ফলের পরিমাণ ফুলের তুলনায় বেড়ে যায়। প্রতিটি পুষ্পদন্ডের মাথায় 14–20 টি করে ফল ধরে। প্রতিটি ফল থেকে 2–3 টি বীজ পাওয়া যায়। ফলের দুই প্রান্ত ঘিরে ছোট ছোট নরম কাঁটা থাকে। বীজ পাকলে খয়েরি রং ধারণ করে। লজ্জাবতী ফলের মাধ্যমে বংশবিস্তার করলেও লতা রোপণ করলেও নতুন চারা পাওয়া যায়।

লজ্জাবতী গাছ সত্যিই কি লজ্জা পায়? কারণ খুঁজতে বসে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, লজ্জাবতীর লজ্জা অর্থাৎ পাতার মুদে যাওয়া আসলে এক ধরণের অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য, যা

চিত্র 1: লজ্জাবতীর (*Mimosa pudica*) ফুল দেখতে যথেষ্ট সুন্দর।

আত্মরক্ষার স্বার্থে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ঘটনাটি সিসমোন্যাস্টিক চলন নামে পরিচিত, যা আসলে একটি অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য। এখন প্রশ্ন হল, হঠাৎ এই ধরনের অভিযোজনের কারণ কি? লজ্জাবতী একটি নরম গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, যা তৃণভোজী প্রাণী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই উদ্ভিদটি আত্মরক্ষার স্বার্থে প্রায়শই এমন অভিযোজনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। লজ্জাবতী গাছকে স্পর্শ মাত্রই পাতাগুলি কুঁকড়ে যায় এবং উদ্ভিদটিকে আপেক্ষিকভাবে খর্ব দেখায়, সেই সঙ্গে এর কাঁটাগুলি আরও বেশী করে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পেছনেও এক মস্ত বিজ্ঞান রয়েছে। লজ্জাবতীর পাতাগুলি দ্বিপক্ষল যৌগপত্র এবং প্রতিটি পাতার পত্রবৃন্তটি স্ফীত এবং দুই ধরনের কোশ (যথাক্রমে ফ্লেক্সর ও

চিত্র 2: হালকা স্পর্শ করলেই পত্রকগুলি মুদে যায় এবং নুইয়ে পড়ে।

এক্সটেনসর) দ্বারা গঠিত। পাতাগুলি বহিরাগত কোন বস্তুর সংস্পর্শে এলেই এই স্ফীত অংশ থেকে লবণাক্ত জল, মুলত পটাশিয়াম আয়ন অভিস্রবন প্রক্রিয়ায় ফ্লেক্সর কোশগুলি থেকে বেরিয়ে যায়। ফলে পটাশিয়াম ও ক্লোরিন আয়নের তারতম্যের দরুন সৃষ্ট সামগ্রিক চাপ কমে যায় এবং পাতার পত্রকগুলি সংকুচিত হয়ে নুইয়ে পড়ে (চিত্র 2)। ফলে উদ্ভিদটি পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখা তার কাঁটাগুলিকে উঁচিয়ে ধরতে সক্ষম হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৃণভোজীরা লজ্জাবতীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তবে আত্মরক্ষার এই প্রক্রিয়া বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে সালোকসংশ্লেষের হার দ্রুত কমে যায়। সেক্ষেত্রে গাছটির প্রাণনাশের সংশয়ও থাকে। কখনও কখনও এই অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যটি গাছটির স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। তাই, এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় না। কিছু সময় পর ধীরে ধীরে গাছটির আয়ন ভারসাম্য ফিরে আসে এবং এক্সটেনসর কোশগুলি পুনরায় স্ফীত হয়ে ওঠে।

সত্যিই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে প্রতিনিয়ত কতই না ঘটনার ঘনঘটা লক্ষ্য করা যায়। আর সেই ছোট্ট কিংবা তথাকথিত তুচ্ছ প্রতিটি ঘটনার পেছনে রয়েছে কত জানা অজানা বিজ্ঞানের রহস্যময় ব্যাখ্যা। তাই বলা যেতে পারে, প্রকৃতিই হল বিজ্ঞানের জীবন্ত ল্যাবরেটরি।

*লেখিকা **কুমারী অরুণিমা ভৌমিক** একজন বিজ্ঞান লেখিকা ও লোকবিজ্ঞান প্রচারক। ইমেল: arunimabhaumik10@gmail.com*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের ফেব্রুয়ারী মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

দাবা খেলায় প্রথম কম্পিউটারের জিৎ

ডিপ ব্লু ছিল দাবা খেলার জন্য তৈরি একটি বিশেষায়িত আইবিএম আরএস/6000 এসপি সুপারকম্পিউটার, যা ডিজাইন করেছিলেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী ফেং-হসিউং সু। এটিই ছিল প্রথম কম্পিউটার যা প্রচলিত সময় নিয়ন্ত্রণের অধীনে একজন তৎকালীন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে একটি গেম এবং একটি ম্যাচ জিতেছিল। এর উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছিল 1995 সালে কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটিতে চিপটেস্ট নামে। এরপর এটি আইবিএম-এ স্থানান্তরিত হয়, যেখানে প্রথমে এর নাম পরিবর্তন করে ডিপ থট রাখা হয়, এবং পরে 1989 সালে আবার নাম পরিবর্তন করে ডিপ ব্লু রাখা হয়। এটি প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভের সাথে 1996 সালের 10ই ফেব্রুয়ারী একটি ছয়-গেমের ম্যাচে খেলে, যেখানে এটি একটি গেমে জয়লাভ করে, দুটি ড্র করে এবং তিনটি গেমে হেরে যায়। ম্যাচের সার্বিক ফলাফলে হেরে গেলেও এই একটি গেমে ডিপ ব্লুয়ের জয়লাভ ছিল একজন মানুষের বিরুদ্ধে দাবা খেলায় কম্পিউটারের প্রথম জয়লাভ। 1997 সালে এটিকে উন্নত করা হয় এবং একটি ছয়-গেমের ফিরতি ম্যাচে এটি দুটি গেমে জয়লাভ ও তিনটি ড্র করে কাসপারভকে পরাজিত করে। ডিপ ব্লু-এর এই বিজয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি বেশ কয়েকটি বই ও চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হয়েছে। বর্তমানে, ডিপ ব্লু গঠনকারী দুটি র‍্যাকের মধ্যে একটি ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ আমেরিকান হিস্টোরির কাছে রয়েছে, যা পূর্বে তথ্য যুগ সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছিল, এবং অন্য র‍্যাকটি 1997 সালে কম্পিউটার হিস্ট্রি মিউজিয়াম অধিগ্রহণ করে এবং এটি তাদের 'রেভোলিউশন' প্রদর্শনীর "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্স" গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। ●

দূরদর্শনে প্রথম কল্পবিজ্ঞান অনুষ্ঠান

1938 সালের 11 ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ টেলিভিশনের একটি বিশেষ দিন, এই দিনই বিবিসি প্রথম কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক টিভি শো সম্প্রচার করে। এটি ছিল কারেল চাপেকের নাটক "আর.ইউ.আর."-এর একটি অংশের রূপান্তর, যে নাটকটি থেকেই "রোবট" শব্দটি প্রচলিত হয়। চাপেকের নাটকেই প্রথম এমন অ্যান্ড্রয়েডদের দেখানো হয়েছিল যারা তাদের মানব সৃষ্টিকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। নাটকটি মূল চেক ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল, যা "রোবট" শব্দটির ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করে। চেক ভাষায় "রোবোটা" শব্দের অর্থ হলো "কাজ"। এই নাটকের গল্পটি সংক্ষেপে—একটি দ্বীপের কারখানা, রসম'স ইউনিভার্সাল রোবটস, মানুষের ক্লোন তৈরি করে। দশ বছরের মধ্যে এই ক্লোনগুলো বিকশিত হয় এবং একটি বিপ্লবের মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে হত্যা করে পৃথিবীর দখল নেয়। চিত্রগ্রহণ করা হয়েছিল বিবিসির আলেকজান্দ্রা প্যালেস স্টুডিওতে এবং সম্প্রচার টাওয়ারের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে দর্শকসংখ্যা উত্তর লন্ডনের একটি ছোট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় 30 মিনিটের মূল অনুষ্ঠানটি সংরক্ষিত করে রাখা হয়নি এবং অনুষ্ঠানটির কেবল কয়েকটি অস্পষ্ট স্থিরচিত্র অবশিষ্ট আছে। কল্পবিজ্ঞান কাহিনিকে টেলিভিশনে রূপান্তরের এই অগ্রণী প্রচেষ্টাটি বিবিসি এবং অন্যান্য চ্যানেলে উদ্ভাবনী কল্পবিজ্ঞান কাহিনিমূলক অনুষ্ঠানের এক দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ●

লরেনসিয়াম আবিষ্কার

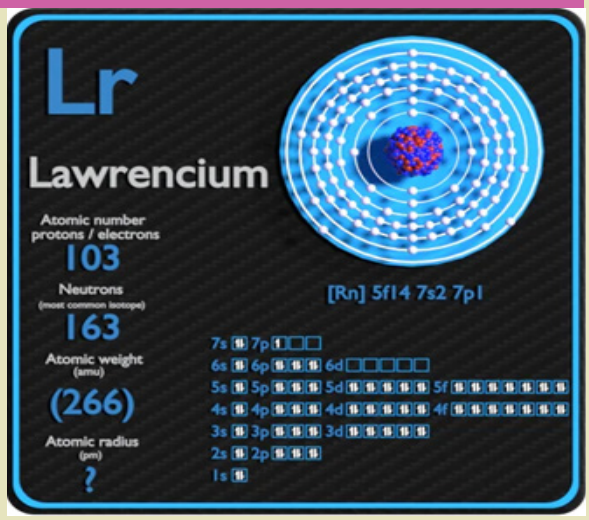

লরেনসিয়াম একটি কৃত্রিম রাসায়নিক মৌল; এর প্রতীক Lr (পূর্বে Lw) এবং পারমাণবিক সংখ্যা 103। এর নামকরণ করা হয়েছে সাইক্লোট্রনের আবিষ্কারক আর্নেস্ট লরেন্সের নামে, যা অনেক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কারে ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। তেজস্ক্রিয় ধাতু লরেনসিয়াম হলো একাদশ ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল, তৃতীয় ট্রান্সফার্মিয়াম এবং অ্যাক্টিনাইড সিরিজের শেষ সদস্য। 100-এর বেশি পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত সমস্ত মৌলের মতো, লরেনসিয়ামকেও শুধুমাত্র কণা ত্বরণযন্ত্রে হালকা মৌলগুলোকে চার্জযুক্ত কণা দ্বারা আঘাত করে তৈরি করা যায়। লরেনসিয়ামের চৌদ্দটি আইসোটোপ জানা আছে; এদের মধ্যে সবচেয়ে স্থিতিশীল হলো ^{266}Lr যার অর্ধায়ু 11 ঘণ্টা, কিন্তু স্বল্পস্থায়ী ^{260}Lr (অর্ধায়ু 2.7 মিনিট) রসায়নে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ এটি বৃহত্তর পরিসরে উৎপাদন করা সম্ভব। লরেনসিয়াম প্রথম সংশ্লেষিত হয়েছিল 1961 সালের 14 ফেব্রুয়ারী। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলের অ্যালবার্ট গিয়োরসোর নেতৃত্বে একটি গবেষক দল যারা বোরন আয়ন দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ামকে আঘাত করে এটি তৈরি করেন। একটি সোভিয়েত দলও 1965 সালে ডুবনায় এর আবিষ্কারের কথা জানায়। যদিও এর চরম তেজস্ক্রিয়তা এবং স্বল্প অর্ধায়ুর কারণে এর বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট ছিল না, অনুমান করা হয় এটি একটি কৃত্রিম অ্যাক্টিনাইড যা Lr^{3+} আয়নের মতো আচরণ করবে। রসায়নের পরীক্ষাগুলো নিশ্চিত করে যে লরেনসিয়াম পর্যায় সারণিতে লুটেসিয়ামের সমগোত্রীয় একটি ভারী মৌল হিসেবে আচরণ করে এবং এটি ত্রিযোজী। তাই এটিকে সপ্তম পর্যায়ের প্রথম অবস্থান্তর ধাতু হিসেবেও শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। পর্যায় সারণিতে এর অবস্থানের জন্য এর ইলেকট্রন বিন্যাসটি ব্যতিক্রমী, কারণ এর সমগোত্রীয় লুটেসিয়ামের s^2d বিন্যাসের পরিবর্তে এর বিন্যাস হলো s^2p। 1971 সালে আইইউপিএসি লরেনসিয়াম মৌলটির আবিষ্কারের কৃতিত্ব লরেন্স বার্কলে ল্যাবরেটরিকে প্রদান করে, যদিও তাদের কাছে মৌলটির অস্তিত্বের জন্য আদর্শ ডেটা ছিল না। কিন্তু 1992 সালে আইইউপিএসি ট্রান্সফারমিয়াম ওয়ার্কিং গ্রুপ (টিডব্লিউজি) আনুষ্ঠানিকভাবে ডুবনা এবং বার্কলের পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা দলগুলিকে লরেনসিয়ামের সহ-আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ●

মানব জিনোমের প্রথম কার্যকারী খসড়া প্রকাশ

মানব জিনোমের প্রথম খসড়াটি 2000 সালের 26শে জুন নির্ধারিত সময়ের আগেই হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট (HGP) এবং সেলেরা জিনোমিক্স দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং 2001 সালের 15 ফেব্রুয়ারিতে নেচার পত্রিকায় এর বিস্তারিত তথ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে এই তথ্য সায়েন্স পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট (এইচজিপি) ছিল একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকল্প, যার লক্ষ্য ছিল মানব ডিএনএ গঠনকারী বেস জোড়াগুলো নির্ধারণ করা এবং শারীরিক ও কার্যকরী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জিনোমের সমস্ত জিনকে শনাক্ত করা, মানচিত্রায়ন করা ও সেগুলোর সিকোয়েন্স নির্ণয় করা। এটি 1990 সালে শুরু হয়েছিল এবং 2003 সালে সম্পন্ন হয়। এটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম সহযোগিতামূলক জৈবিক প্রকল্প। এই প্রকল্পের পরিকল্পনা 1984 সালে মার্কিন সরকার শুরু করে এবং এটি আনুষ্ঠানিকভাবে 1990 সালে চালু হয়। 2003 সালের 14ই এপ্রিল এটিকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়ন এসেছিল মার্কিন সরকার এবং বিশ্বের আরও অসংখ্য সংস্থা থেকে। বেসরকারি ভাবে সেলারা কর্পোরেশন বা সেলারা জিনোমিক্স দ্বারা একটি সমান্তরাল প্রকল্প পরিচালিত হয়েছিল, যা আনুষ্ঠানিকভাবে 1998 সালে চালু করা হয়। সরকার-পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বেশিরভাগ সিকোয়েন্সিংয়ের কাজ আন্তর্জাতিক মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং কনসোর্টিয়াম (IHGSC)-এর অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি এবং চীনের বিশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়েছিল। এই খসড়াটি জিনোমের 97% অংশকে ম্যাপ করেছে, যার মধ্যে 85% অংশের সিকোয়েন্সিং 99.9%-এরও বেশি নির্ভুলতার সাথে করা হয়েছিল। এতে 38,000টি নিশ্চিত জিন এবং 1,15,000টি সম্ভাব্য জিন রয়েছে। যদিও এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি আমাদের জেনেটিক কোডের 90 শতাংশেরও বেশি অংশকে ম্যাপ করেছিল, কিন্তু কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল। চূড়ান্ত, প্রায় সম্পূর্ণ সিকোয়েন্সটি বহু বছর পরে 2003 সালে HGP দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল এবং 2022 সালে T2T কনসোর্টিয়াম দ্বারা এটি সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা হয়। ●

ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা

শম্ভুনাথ দে

শম্ভুনাথ দের জন্ম 1915 সালের 1লা ফেব্রুয়ারি। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী, যার কাজ কলেরা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করেছিল। তিনি 1939 সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবি ডিগ্রি এবং 1942 সালে ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। 1949 সালে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতাল থেকে প্যাথলজিতে পিএইচডি অর্জনের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং তার কর্মজীবন কলেরার রোগতত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসর্গ করেন। 1959 সালে কলেরা টক্সিন আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি প্রথমবারের মতো প্রমাণ করেন যে, *ভিব্রিও কলেরি* সরাসরি টিস্যু আক্রমণ না করে একটি এন্টারোটক্সিন নিঃসরণের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করে। তিনি লাইগেটেড ইন্টেস্টাইনাল লুপ এবং ইলিয়াল লুপ মডেলও তৈরি করেন, যা কলেরা এবং ই. *কোলাই* দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া রোগ অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়। তার কাজ সিক্রেটরি ডায়রিয়ার প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করে এবং ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির ভিত্তি স্থাপন করে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। সাধারণ পরীক্ষাগারের পরিবেশে কাজ করা সত্ত্বেও তিনি 30টিরও বেশি প্রভাবশালী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি 1973 সালে অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু আমৃত্যু তার গবেষণার কাজ চলতে থাকে। 1985 সালের 15ই এপ্রিল তার মৃত্যু হয়। তার আবিষ্কারগুলো আধুনিক অণুজীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

চার্লস ডারউইন

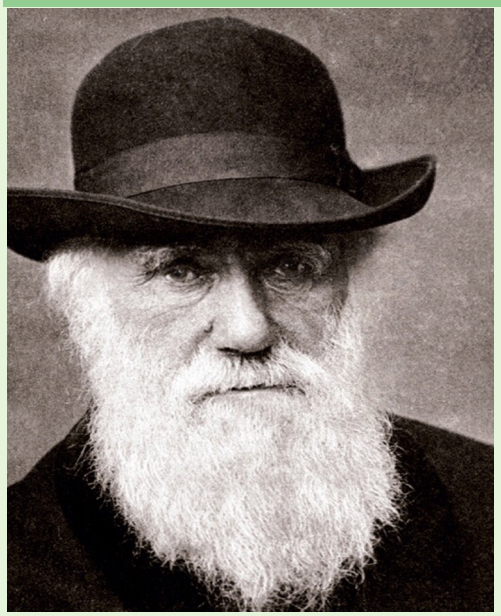

চার্লস ডারউইনের জন্ম 1809 সালের 12ই ফেব্রুয়ারি। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও জীববিজ্ঞানী, যিনি বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত প্রজাতি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে, যে প্রক্রিয়ায় সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিরা বেঁচে থাকার এবং বংশবৃদ্ধি করার অধিকতর সুযোগ পায়। 1858 সালে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের সাথে যৌথভাবে উপস্থাপিত এই ধারণাটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। প্রকৃতির প্রতি ডারউইনের প্রাথমিক আগ্রহ তাকে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। কেমব্রিজের ক্রাইস্ট'স কলেজে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গভীর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 1831 থেকে 1836 সাল পর্যন্ত এইচএমএস বিগ্‌ল জাহাজে তার পাঁচ বছরের সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল, যা তাকে বিশ্বজুড়ে ভূতত্ত্ব, জীবাশ্ম এবং জীবন্ত প্রাণী নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ করে দেয়। এই পর্যবেক্ষণগুলো ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ধারণাকে সমর্থন করেছিল এবং তার বিবর্তনীয় ধারণাগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ডারউইন বেশ কিছু প্রভাবশালী গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যার মধ্যে রয়েছে 'অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস' (1859), 'দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান' (1871), এবং অর্কিড, আবেগ ও কেঁচো সম্পর্কিত গবেষণা। উনিশ শতকের শেষের দিকে বিবর্তনবাদ ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। যদিও শুরুর দিকে ডারউইনের মতবাদকে তৎকালীন ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে মনে করা হতো, ক্রমে ডারউইনের তত্ত্ব আধুনিক জীবন বিজ্ঞানের ঐক্যবদ্ধ ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এটি আজও বিশ্বজুড়ে জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জিনতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রভাবিত করে চলেছে।

গ্যালিলিও গ্যালিলি

রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী গ্যালিলিও গ্যালিলির জন্ম 1564 সালের 15 ফেব্রুয়ারি। তাকে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞান, আধুনিক ধ্রুপদী পদার্থবিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। গ্যালিলিও গতি, মাধ্যাকর্ষণ, জড়তা, প্রাসের গতি এবং আপেক্ষিকতার নীতি নিয়ে গবেষণা করেন, যা পরবর্তী বিজ্ঞানীদের জন্য ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনি ফলিত বিজ্ঞানেও কাজ করেছিলেন, পেন্ডুলামের গতি বর্ণনা করেছিলেন, হাইড্রোস্ট্যাটিক ব্যালেন্স আবিষ্কার করেছিলেন এবং থার্মোস্কোপ ও সামরিক কম্পাসের মতো প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। নিজে তৈরি করা একটি উন্নত দূরবীন ব্যবহার করে গ্যালিলিও যুগান্তকারী জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আকাশগঙ্গা, শুক্রের দশা, বৃহস্পতির চারটি বৃহত্তম চাঁদ, শনির বলয়, সৌরকলঙ্ক এবং চাঁদের অসম পৃষ্ঠ নিয়ে গবেষণা করেন। এই আবিষ্কারগুলো কোপারনিকাসের এই তত্ত্বকে সমর্থন করেছিল যে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে। সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদের প্রতি গ্যালিলিওর সমর্থন তাকে ক্যাথলিক চার্চের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে ফেলে। 1633 সালে রোমান ইনকুইজিশন তার বিচার করে, তাকে তার মতবাদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয় এবং গৃহবন্দী করে রাখা হয়। এই সময়ে তিনি 'টু নিউ সায়েন্সেস' বইটি লেখেন, যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে ওঠে এবং বিশ্বজুড়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রতি চার্চের বিরোধিতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং 1835 সালের মধ্যে তাঁর কাজের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত হয়। 1992 সালে পোপ জন পল দ্বিতীয় গ্যালিলিওকে নিন্দা করার ক্ষেত্রে চার্চের ভুলের কথা স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে ভ্যাটিকানের বিভিন্ন উদ্যোগে তাঁর বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারকে সম্মান জানানো হয়। ●

শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর

শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর 1894 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় কলোয়েড রসায়নবিদ, শিক্ষাবিদ এবং বৈজ্ঞানিক প্রশাসক। তাঁকে ভারতে গবেষণা পরীক্ষাগারের জনক হিসেবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়। ভাটনাগর ছিলেন কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR)-এর প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর প্রথম চেয়ারম্যান। তাঁর সম্মানে 1958 সালে শান্তি স্বরূপ ভাটনাগর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। ভাটনাগর 1921 সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষকজীবন শুরু করেন, যেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতটিও রচনা করেন। পরে তিনি লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন, যেখানে তিনি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান রাখেন, বিশেষ করে চুম্বক-রসায়নে। তিনি ভাটনাগর-মাথুর ম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স ব্যালেন্স নামক একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সহ-উদ্ভাবক ছিলেন। স্বাধীনতার পর CSIR-এর অধীনে জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলায় তিনি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। ভাটনাগর শিল্প এবং জাতি গঠনে বিজ্ঞানের প্রয়োগে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। 1955 সালের 1লা জানুয়ারি 60 বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রশাসনে এক স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে যান। ●

200

Fully-funded PhD Scholarships

www.nu.edu.kz

ACADEMIC INSTITUTION, STRIVING FOR GLOBAL RECOGNITION AS A LEADING RESEARCH UNIVERSITY

#401-500 IN THE WORLD'S MOST PRESTIGIOUS UNIVERSITY RANKING

#1 IN THE CAUCASUS & CENTRAL ASIA **#1** AMONG CIS COUNTRIES

ASTANA, KAZAKHSTAN

NAZARBAYEV UNIVERSITY

Biomedical Sciences
Business Administration
Chemical Engineering
Chemistry
Civil Engineering
Computer Sciences
Education
Electrical Engineering
Eurasian Studies
Geology
Global Health
Life Sciences
Mathematics
Mechanical Engineering
Mining Engineering
Petroleum Engineering
Physics
Public Policy
Robotics
Science, Engineering & Technology

"OUR PLAN TO INCREASE THE NUMBER OF PHD STUDENTS TO 1,000 IN THE COMING YEARS REFLECTS OUR COMMITMENT TO OUTSTANDING RESEARCH THAT ADDRESSES NATIONAL AND REGIONAL CHALLENGES, AS WELL AS TO STRENGTHENING RESEARCH CAPACITY IN KAZAKHSTAN"

PRESIDENT OF NU, PROFESSOR WAQAR AHMAD

For details contact us at: S&N Solutions, New Delhi 110 058 India
visit: www.snsols.com | E: info@snsols.com | T: +91 11 4036 5723 | M: +91 92059 79600

লেখকদের জন্য: বাংলা বিজ্ঞান কথায় অনধিক 1200 শব্দের মধ্যে বাংলায় লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ, বিজ্ঞানের গল্প, কল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে লেখা পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হাতে লেখা বা ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি এবং পৃথকভাবে লেখা সংক্রান্ত ছবি পাঠানোর জন্য Bangla Bigyan Katha, Shanti Foundation, UG 17, Jyoti Shikhar, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110060 ঠিকানায় চিঠি পাঠান বা ইমেল করুন: amitesh.shantifoundation@gmail.com। প্রতিটি লেখার শেষে অবশ্যই লেখক পরিচিতি ও লেখকের ইমেল উল্লেখ করুন।